আলোচনা।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত।

উৎসর্গ।

এই গ্রন্থ পিতৃদেবের শ্রীচরণে উৎসর্গ করিলাম।

গ্রন্থকার।

সূচীপত্র।

বিষয় | পৃষ্ঠা।

ডুব দেওয়া।

ছোট বড়।

ডুবিয়া যাওয়া কথাটা সচরাচর ব্যবহার হইয়া থাকে। কিন্তু ডুবিয়া মরিবার ক্ষমতা ও অধিকার কয়জন লোকেরই বা আছে! কথাটার প্রকৃত ভাবই বা কে জানে! কবিরা, ভাবুকেরা, ভক্তেরা কেবল বলেন ডুবিয়া যাও, ইতর লোকেরা চারিদিকে চাহিয়া কঠিন মাটিতে পা দিয়া অবাক হইয়া বলে, ডুবিব কোন্ খানে, ডুবিবার স্থান কোথায়!

জানিয়া অবশেষে যখন শ্রান্ত হইয়া সমুদয় জ্ঞান-শৃঙ্খলকে অতি বৃহৎ স্তূপাকৃতি করিয়া তুলা গেল তখনও দেখা গেল বালির শেষ হইল না। অতএব নিতান্ত জড়ভাবে না দেখিয়া মানসিক ভাবে দেখিলে বালুকণার আকার আয়তন কোথায় অদৃশ্য হইয়া যায়, জানা যায় যে তাহা অসীম।

আমরা যাহাকে সচরাচর ক্ষুদ্রতা বা বৃহত্ত্ব বলি, তাহা কোন কাজের কথা নহে। আমাদের চক্ষু যদি অণুবীক্ষণের মত হইত তাহা হইলেই এখন যাহাকে ক্ষুদ্র দেখিতেছি, তখন তাহাকেই অতিশয় বৃহৎ দেখিতাম। এই অণুবীক্ষণতা শক্তি কল্পনায় যতই বাড়াইতে ইচ্ছা কর ততই বাড়িতে পারে। অত গোলে কাজ কি, পরমাণুর বিভাজ্যতার ত আর কোথাও শেষ নাই; অতএব একটি বালুকণার মধ্যে অনন্ত পরমাণু আছে, একটি পর্ব্বতের মধ্যেও অনন্ত পর-

মাণু আছে, ছোট বড় আর কোথায় রহিল! একটি পর্ব্বতও যা পর্ব্বতের প্রত্যেক ক্ষুদ্রতম অংশও তাই; কেহই ছোট নহে, কেহই বড় নহে, কেহই অংশ নহে সকলেই সমান। বালুকণা কেবল যে জ্ঞেয়তায় অসীম, দেশে অসীম তাহা নহে, তাহা কালেও অসীম, তাহারই মধ্যে তাহার অনন্ত ভূত ভবিষ্যত বর্ত্তমান একত্রে বিরাজ করিতেছে। তাহাকে বিস্তার করিলে দেশেও তাহার শেষ পাওয়া যায় না, তাহাকে বিস্তার করিলে কালেও তাহার শেষ পাওয়া যায় না। অতএব একটি বালুকা অসীম দেশ অসীম কাল অসীম শক্তি সুতরাং অসীম জ্ঞেয়তার সংহত কণিকা মাত্র। চোখে ছোট দেখিতেছি বলিয়া একটা জিনিষ সীমাবদ্ধ নাও হইতে পারে। হয়ত ছোট বড়র উপর অসীমতা কিছু মাত্র নির্ভর করে না। হয়ত ছোটও যেমন অসীম হইতে পারে বড়ও তেমনি

অসীম হইতে পারে। হয়ত অসীমকে ছোটই বল আর বড়ই বল সে কিছুই গায়ে পাতিয়া লয় না।

"যাহা কিছু, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনন্ত সকলি,
বালুকার কণা, সেও অসীম অপার,
তারি মধ্যে বাঁধা আছে অনন্ত আকাশ—
কে আছে, কে পারে তারে আয়ত্ত করিতে!
বড় ছোট কিছু নাই, সকলি মহৎ।"

যাহা বলিলাম তাহা কিছুই বুঝা গেল না, কেবল কতকগুলা কথা কহা গেল মাত্র। কিন্তু কোন্ কথাটাই বা সত্য! বালুকা সম্বন্ধে যে কথাই বলা হইয়া থাকে, তাহাতে বালুকার যথার্থ স্বরূপ কিছুই বুঝা যায় না, একটা কথা মুখস্থ করিয়া রাখা যায়। ইহাতেও কিছু ভাল বুঝা গেল না, কেবল একটা বুঝিবার প্রয়াস প্রকাশ পাইল মাত্র।

বিজ্ঞ লোকেরা তিরস্কার করিয়া বলিবেন, যাহা বুঝা যায় না, তাহার জন্য এত প্রয়াসই বা কেন! কিন্তু তাঁহারা কোথাকার কে! তাঁহাদের কথা শোনে কে! তাঁহারা কোন্ দিন ঝরণাকে তিরস্কার করিতে যাইবেন, সে উপর হইতে নীচে পড়ে কেন! কোন্ দিন ধোঁয়ার প্রতি আইনজারি করিবেন সে যেন নীচে হইতে উপরে না ওঠে।

ডুবিবার ক্ষমতা।

যাহা হউক্ আর কিছু বুঝি না বুঝি এটা বোঝা যায় জগতের সর্ব্বত্রই অতল সমুদ্র। মহিষের মত পাঁকে গা ডুবাইয়া নাকটুকু জলের উপরে বাহির করিয়া জগতের তলা পাইয়াছি বলিয়া যে নিশ্চিন্ত ভাবে জড়ের মত নিদ্রা দিব

তাহার যো নাই। এক এক জন লোক আছেন তাঁহাদের কিছুই যথেষ্ট মনে হয় না—খানিকটা গিয়াই সমস্ত শেষ হইয়া যায় ও বলিয়া উঠেন, এই বইত নয়! এই ক্ষুদ্রেরা মনে করেন, জগতের সর্ব্বত্রই তাঁহাদের হাঁটুজল, ডুবজল কোন খানেই নাই। জগতের সকলেরই উপরে ইহাঁরা মাথা তুলিয়া আছেন—ঐ অভিমানী মাথাটা সবসুদ্ধ ডুবাইয়া দিতে পারেন, এমন স্থান পাইতেছেন না! অস্থির হইয়া চারিদিকে অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছেন। ইহাঁরা যে জগতের অসম্পূর্ণতা ও নিজের মহত্ব লইয়া গর্ব্ব করিতেছেন ইহাঁদের গর্ব্ব ঘুচিয়া যায় যদি জানিতে পারেন ডুব দিবার ক্ষমতা ও অধিকার সকলের নাই। বিশেষ গৌরব থাকা চাই তবে মগ্ন হইতে পারিবে। সোলা যখন জলের চারদিকে অসন্তুষ্ট ভাবে ভাসিয়া বেড়ায় তখন কি মনে

করিতে হইবে কোথাও তাহার ডুব দিবার উপ-যোগী স্থান নাই! সে তাই মনে করুক্ কিন্তু জলের গভীরতা তাহাতে কমিবে না।

"আঁখি মুদে জগতেরে বাহিরে ফেলিয়া,
অসীমের অন্বেষণে কোথা গিয়েছিনু।"

ডুবিবার স্থান।

যখন একটা কুকুর একটি গোলাপ ফুল দেখে, তখন তাহার দেখা অতি শীঘ্রই ফুরাইয়া যায়—কারণ ফুলটি কিছু বড় নহে। কিন্তু এক জন ভাবুক যখন সেই ফুলটি দেখেন তখন তাঁহার দেখা শীঘ্র ফুরায় না, যদিও সে ফুলটি দেড় ইঞ্চি অপেক্ষা আয়ত নহে। কারণ সে গোলাপ ফুলের গভীরতা নিতান্ত সামান্য নহে। যদিও তাহাতে দুই ফোঁটার বেশী শিশির ধরে না,

তথাপি হৃদয়ের প্রেম তাহাকে যতই দাও না কেন, তাহার ধারণ করিবার স্থান আছে। সে ক্ষুদ্রকায় বলিয়া যে তোমার হৃদয়কে তাহার বক্ষস্থিত কীটের মত গোটাকতক পাপড়ির মধ্যে কারারুদ্ধ করিয়া রাখে তাহা নহে। সে আরো তোমাকে এমন এক নূতন বিচরণের স্থানে লইয়া যায়, যেখানে এত বেশী স্বাধীনতা যে এক প্রকার অনির্দ্দেশ্য অনির্ব্বচনীয়তার মধ্যে হারা হইয়া যাইতে হয়। তখন এক প্রকার অস্ফুট দৈব-বাণীর মত হৃদয়ের মধ্যে শুনিতে পাওয়া যায়, যে, সকলেরই মধ্যে অসীম আছে; যাহাকেই তুমি ভাল বাসিবে সেই তোমাকে তাহার অসী-মের মধ্যে লইয়া যাইবে, সেই তোমাকে তাহার অসীম দান করিবে। কে না জানেন যাহাকে যত ভাল বাসা যায় সে ততই বেশী হইয়া উঠে—নহিলে প্রেমিক কেন বলিবেন, "জনম

অবধি হম রূপ নেহারনু নয়ন না তিরপিত ভেল!”

একটা মানুষ যত বড়ই হউক না কেন, তাহাকে দেখিতে কিছু বেশীক্ষণ লাগে না—কিন্তু আজন্ম কাল দেখিয়াও যখন দেখা ফুরায় না তখন সে না-জানি কত বড় হইয়া উঠিয়াছে! ইহার অর্থ আর কিছুই নহে, অনুরাগের প্রভাবে প্রেমিক একজন মানুষের অন্তরস্থিত অসীমের মধ্যে প্রবেশাধিকার পাইয়াছেন, সেখানে, সে মানুষের আর অন্ত পাওয়া যায় না; হৃদয় যতই দাও ততই সে গ্রহণ করে, যত দেখ ততই নতুন দেখা যায়, যত তোমার ক্ষমতা আছে ততই তুমি নিমগ্ন হইতে পার। এই জন্যই যথার্থ অনুরাগের মধ্যে একপ্রকার ব্যাকুলতা আছে। সে এত-খানি পায় যে তাহা প্রাণ ভরিয়া আয়ত্ত করিতে পারে না—তাহার এত বেশী তৃপ্তি বর্ত্তমান, যে, সে-তৃপ্তিকে সে সর্ব্বতোভাবে অধিকার করিতে

পারে না ও তাহা সুমধুর অতৃপ্তিরূপে চতুর্দ্দিক পূর্ণ করিয়া বিরাজ করিতে থাকে। যেখানে অনুরাগ নাই সেই খানেই সীমা, সেই খানেই মহা অসীমের দ্বার রুদ্ধ, সেইখানেই চারিদিকে লৌহের ভিত্তি, কারাগার! জগৎকে যে ভাল বাসিতে শিখে নাই, সে ব্যক্তি অন্ধকূপের মধ্যে আট্‌কা পড়িয়াছে। সে মনে করিতেও পারে না এই টুকুর বাহিরেও কিছু থাকিতে পারে। তাহার নিজের পায়ের শিক্‌লিটার ঝম্‌ ঝম্‌ শব্দই তাহার জগতের একমাত্র সঙ্গীত। সে কল্পনাও করিতে পারে না কোথাও পাখী ডাকে, কোথাও সূর্য্যের কিরণ বিকীরিত হয়।

অনুরাগেই যে যথার্থ স্বাধীনতা তাহার একটা প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। সম্পূর্ণ নূতন লোকের মধ্যে গিয়া পড়িলে আমরা যেন নিশ্বাস লইতে পারি না, হাত পা ছড়াইতে সঙ্কোচ হয়,

যে কেহ লোক থাকে সকলেই যেন বাধার মত বিরাজ করিতে থাকে, তাহারা সদয় ব্যবহার করিলেও সকল সময়ে মনের সঙ্কোচ দূর হয় না। তাহার কারণ, এক মাত্র অনুরাগের অভাব বশতঃ আমরা তাহাদের হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিতে পাই না, যেখানে স্বাধীনতার যথার্থ বিচরণ-ভূমি সে স্থান আমাদের নিকটে রুদ্ধ। আমরা কেবলি তাহাদের নাকে চোখে মুখে, আচারে ব্যবহারে, নূতন ধরণের কথায় বার্ত্তায় হুঁচট ঠোকর ধাক্কা খাইতে থাকি।

পুরাতনের নূতনত্ব।

অতএব দেখা যাইতেছে জগতের সমস্ত দৃশ্যের মধ্যে অনন্ত অদৃশ্য বর্ত্তমান। নিত্যনূতন নামক যে শব্দটা কবিরা ব্যবহার করিয়া থাকেন

সেটা কি নিতান্ত একটা কথার কথা, একটা আলঙ্কারিক উক্তি মাত্র! তাহার মধ্যে গভীর সত্য আছে। অসীম যতই পুরাতন হউক্ না কেন তাহার নূতনত্ব কিছুতেই ঘুচে না। সে যতই পুরাতন হইতে থাকে ততই বেশী নূতন হইতে থাকে, সে দেখিতে যতই ক্ষুদ্র হউক্ না কেন, *প্রত্যহই তাহাকে অত্যন্ত অধিক করিয়া পাইতে থাকি। এই নিমিত্ত যথার্থ যে প্রেমিক সে আর* নূতনের জন্য সর্ব্বদা লালায়িত নহে, শুদ্ধ তাহাই নয়, পুরাতন ছাড়িয়া সে থাকিতে পারে না। কারণ নূতন অতি ক্ষুদ্র, পুরাতন অতি বৃহৎ। পুরাতন যতই পুরাতন হইতে থাকে ততই তাহার অসীম বিস্তার প্রেমিকের নিকট অবারিত হইতে থাকে, হৃদয় ততই তাহার মর্ম্মস্থানের অভিমুখে ক্রমাগত ধাবমান হইতে থাকে, ততই জানিতে পারা যায় হৃদয়ের বিচরণক্ষেত্র অতি

বৃহৎ, হৃদয়ের স্বাধীনতার কোথাও বাধা নাই। যে ব্যক্তি একবার এই পুরাতনের গভীরতার মধ্যে মগ্ন হইতে পারিয়াছে, এই সাগরের হৃদয়ে সন্তরণ করিতে পারিয়াছে সে কি আর ছোট ছোট ব্যাংগুলার আনন্দ-কল্লোল শুনিয়া প্রতারিত হইয়া নূতন নামক সঙ্কীর্ণ কূপটার মধ্যে আপনাকে বদ্ধ করিতে পারে!

সাম্য।

এ জগতে সকলি যে সমান, কেহ যে ছোট-বড় নহে, তাহা প্রেমের চক্ষে ধরা পড়িল। এই নিমিত্ত যখন দেখা যায়, যে, একজন লোক কুৎসিৎ মুখের দিকে অতৃপ্ত নয়নে চাহিয়া আছে, তখন আর আশ্চর্য্য হইবার কোন কারণ নাই—আর একজনকে দেখিতেছি সে সুন্দর মুখের দিকে

ঠিক তেমনি করিয়াই চাহিয়া আছে, ইহাতেও আশ্চর্য্য হইবার কোন কথা নাই। অনুরাগের প্রভাবে উভয়ে মানুষের এমন স্থানে গিয়া পৌঁছিয়াছে, যেখানে সকল মানুষই সমান, যেখানে কাহারও সহিত কাহারো একচুল ছোটবড় নাই, যেখানে সুন্দর কুৎসিৎ প্রভৃতি তুলনা আর খাটেই না। সীমা এবং তুলনীয়তা কেবল উপরে, একবার যদি ইহা ভেদ করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে পার ত দেখিবে সেখানে সমস্তই একাকার, সমস্তই অনন্ত। এতবড় প্রাণ কাহার আছে সেখানে প্রবেশ করিতে পারে, বিশ্বচরাচরের মহাসমুদ্রে অসীম ডুব ডুবিতে পারে। প্রেমে সেই সমুদ্রে সন্তরণ করিতে শিখায়—যাহাকেই ভালবাস না কেন তাহাতেই সেই মহা স্বাধীনতার ন্যূনাধিক আস্বাদ পাওয়া যায়! এই যে শূন্য অনন্ত আকাশ

ইহাও আমাদের কাছে সীমাবদ্ধরূপে প্রকাশ পায়, মনে হয় যেন একটি অচল কঠিন সুগোল নীল মণ্ডপ আমাদিগকে ঘেরিয়া আছে ; যেন খানিক-দূর উঠিলেই আকাশের ছাতে আমাদের মাথা ঠেকিবে। কিন্তু ডানা থাকিলে দেখিতাম ঐ নীলিমা আমাদিগকে বাধা দেয় না, ঐ সীমা আমাদের চোখেরই সীমা ; যদিও মণ্ডপের ঊর্দ্ধে আরও মণ্ডপ দেখিতাম, তদূর্দ্ধে উঠিলে আবার আর-একটা মণ্ডপ দেখিতাম, তথাপি জানিতে পারিতাম যে, উহারা আমাদিগকে মিথ্যা ভয় দেখাইতেছে, উহারা কেবল ফাঁকি মাত্র। আমাদের স্বাধীনতার বাধা আমাদের চক্ষু, কিন্তু বাস্তবিক বাধা কোথাও নাই!

স্বদেশ।

আমার একজন বন্ধু দার্জিলিং কাশ্মীর প্রভৃতি নানা রমণীয় দেশ ভ্রমণ করিয়া আসিয়া বলিলেন—বাঙ্গালার মত কিছুই লাগিল না। কথাটা শুনিয়া অধিকাংশ লোকই হাসিবেন। কিন্তু হাসিবার বিশেষ কারণ দেখিতেছি না। বরং যাঁহারা বলেন বাঙ্গালায় দেখিবার কিছুই নাই, সমস্তটাই প্রায় সমতল স্থান, পাহাড় পর্ব্বত প্রভৃতি বৈচিত্র্য কিছুই নাই, দেশটা দেখিতে ভালই নহে, তাঁহাদের কথা শুনিলেই বাস্তবিক আশ্চর্য্য বোধ হয়। বাঙ্গালা দেশ দেখিতে ভাল নয়। এমন মায়ের মত দেশ আছে। এত কোল-ভরা শস্য, এমন শ্যামল পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্য, এমন স্নেহধারাশালিনী ভাগীরথীপ্রাণা কোমল হৃদয়া, তরুলতাদের প্রতি এমনতর অনির্ব্বচনীয়

করুণাময়ী মাতৃভূমি কোথায়। একজন বিদেশী আসিয়া যাহা বলে শোভা পায়, কিন্তু আজন্ম-কাল ইহাঁর কোলে যে মানুষ হইয়াছে সেও ইহাঁর সৌন্দর্য্য দেখিতে পায় না। সে ব্যক্তি যে প্রেমিক নহে ইহা নিশ্চয়ই। সুতরাং বাঙ্গলা দেশে সে বাস করে মাত্র, কিন্তু বাংলা দেশ সে দেখেই নি—বাঙ্গলা দেশে সে কখনো যায় নি, ম্যাপে দেখিয়াছে মাত্র। এত দেশে গিয়াছি এত নদী দেখিয়াছি কিন্তু বাংলার গঙ্গা যেমন এমন নদী আর কোথাও দেখি নাই। কিন্তু কেন? অমুক দেশে একটা নদী আছে সেটা গঙ্গার চেয়ে চওড়া—অমুক সাগরে একটা নদী পড়িয়াছে সেটা গঙ্গার চেয়ে দীর্ঘ—অমুক স্থানে একটা নদী বহিতেছে, গঙ্গার চেয়ে তাহার তরঙ্গ বেশী। ইত্যাদি।

কেন।

এই কেন লইয়াইত যত মারামারী। যে ভালবাসে সে কেনর উত্তর দিতে পারে না। তুমি তর্ক করিলে বাঙ্গলার চেয়ে কাশ্মীর ভাল দেশ হইয়া দাঁড়ায় কিন্তু তবু আমার কাছে কেন বাংলাই ভাল দেশ। তার্কিক বলেন, বাল্যাবধি বাঙ্গলা দেশটা তোমার অভ্যাস হইয়া গিয়াছে, তাই ভাল লাগিতেছে। ঠিক কথা। কিন্তু অভ্যাস হইয়া যাওয়ার দরুণ ভাল লাগিবার কি কারণ হইতে পারে! তাঁহাদের কথার ভাবটা এই যে বাঙ্গলা দেশে আসলে যাহা নাই, আমি তাহাই যেন নিজের তহবিল হইতে দেশকে অর্পণ করি। এ কথা কোন কাজের নহে। প্রকৃত কথা এই যে, প্রেম একটি সাধনা। ভাল বাসিয়া আজন্ম প্রত্যহ দেশের পানে চাহিয়া

দেখিলে দেশ সদয় হইয়া তাঁহার প্রাণের মধ্যে আমাদিগকে লইয়া যান—কারণ সকলেরই প্রাণ আছে। ভাল বাসিলে সকলেই তাহার প্রাণে ডাকিয়া লয়। বাহ্য আকার-আয়তনের মধ্যে স্বাধীনতা নাই, তাহা বাধাবিপত্তিময়—আকার আয়তনের অতীত প্রাণের মধ্যেই স্বাধীনতা—সেখানে পায়ে কিছু ঠেকেনা, চোখে কিছু পড়ে না, শরীরে কিছুই বাধে না—কেবল এক প্রকার অনির্ব্বচনীয় স্বাধীনতার আনন্দ। ইহার কাছে কি আর "কেন" ঘেঁসিতে পারে! স্বদেশে আমাদের হৃদয়ের কি স্বাধীনতা! স্বদেশে আমাদের কতখানি জায়গা! কারণ স্বদেশের শরীর ক্ষুদ্র স্বদেশের হৃদয় বৃহৎ। স্বদেশের হৃদয়ে স্থান পাইয়াছি। স্বদেশের প্রত্যেক গাছপালা আমাদের চোখে ঠেকে না আমরা একেবারেই তাহার ভিতরকার ভাব তাহার হৃদয়পূর্ণ মাধুরী দেখিতে

পাই। এই সৌন্দর্য্য এই স্বাধীনতা সকল দেশের লোকেই সমান উপভোগ করিতে পারেন। ইহার জন্য ভূগোল বিবরণ পড়িয়া রেলোয়ের টিকিট কিনিয়া দূরদূরান্তরে যাইবার প্রয়োজন নাই।

এক কাঠা জমি।

একদল লোক আছেন তাঁহারা যেখানে যতই পুরাতন হইতে থাকেন সেই খানে ততই অনুরাগসূত্রে বদ্ধ হইতে থাকেন। আর একদল লোক আছেন, তাঁহাদিগকে অভ্যাস-সূত্রে কিছুতেই বাঁধিতে পারে না, দশ বৎসর যেখানে আছেন সেও তাঁহার পক্ষে যেমন, আর একদিন যেখানে আছেন সেও তাঁহার পক্ষে তেমনি। লোকে হয়ত বলিবে তিনিই যথার্থ দূরদর্শী,

অপক্ষপাতী, কেবল মাত্র সামান্য অভ্যাসের দরুণ তাঁহার নিকট কোন জিনিষের একটা মিথ্যা বিশেষত্ব প্রতীতি হয় না। বিশ্বজনীনতা তাঁহাতেই সম্ভবে। ঠিক উল্টো কথা। বিশ্বজনীনতা *তাঁহাতেই সম্ভবে না। বিশ্বের প্রত্যেক বিঘা* প্রত্যেক কাঠাতেই বিশ্ব বর্ত্তমান। একদিনে তাহা আয়ত্ত হয় না। প্রত্যহ অধিকার বাড়িতে থাকে। যিনি দশবৎসরে এক স্থানের কিছুই অধিকার করিতে পারিলেন না তিনি বিশ্বকে অধিকার করিবেন কি করিয়া! বিশ্ব সর্ব্বত্রই অসীম গভীর এবং অসীম প্রশস্ত। অতএব বিশ্বের এক কাঠা জমিকে যথার্থ ভালবাসিতে গেলে বিশ্ব-জনীনতা থাকা চাই।

জগৎ মিথ্যা।

যাঁহারা বলেন জগৎ মিথ্যা, তাঁহাদের কথা এক হিসাবে সত্য এক হিসাবে সত্য নয়। বাহির হইতে জগৎকে যেরূপ দেখা যায় তাহা মিথ্যা। তাহার উপরে ঠিক বিশ্বাস স্থাপন করা যায় না।

ঈথর কাঁপিতেছে, আমি দেখিতেছি আলো; বাতাসে তরঙ্গ উঠিতেছে আমি শুনিতেছি শব্দ; ব্যবচ্ছেদবিশিষ্ট অতি সূক্ষ্মতম পরমাণুর মধ্যে আকর্ষণ বিকর্ষণ চলিতেছে আমি দেখিতেছি বৃহৎ দৃঢ় ব্যবচ্ছেদহীন বস্তু। বস্তুবিশেষ কেনই যে বস্তুবিশেষ রূপে প্রতিভাত হয় আর-কিছু রূপে হয় না, তাহার কোন অর্থ পাওয়া যায় না। আশ্চর্য্য কিছুই নাই, আমাদের নিকটে যাহা বস্তুরূপে প্রতিভাত হইতেছে, আর একদল নূতন জীবের নিকটে তাহা কেবল

শব্দরূপে প্রতীত হইতেছে। আমাদের কাছে বস্তু দেখা ও তাহাদের কাছে শব্দ শোনা একই। এমনও আশ্চর্য্য নহে, আর এক নূতন জীব দৃষ্টি শ্রুতি ঘ্রাণ স্বাদ স্পর্শ ব্যতীত আর এক নূতন ইন্দ্রিয়-শক্তি দ্বারা বস্তুকে অনুভব করে তাহা আমাদের কল্পনার অতীত। বস্তুকে ক্রমাগত বিশ্লেষ করিতে গেলে তাহাকে ক্রমাগত সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মে পরিণত করা যায়—অবশেষে এমন হইয়া দাঁড়ায় আমাদের ভাষায় যাহার নাম নাই, আমাদের মনে যাহার ভাব নাই। মুখে বলি তাহা অসংখ্য শক্তির খেলা, কিন্তু শক্তি বলিতে আমরা কিছুই বুঝিনা। অতএব আমরা যাহা দেখিতেছি শুনিতেছি, তাহার উপরে অনন্ত বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি না। কাজের সুবিধার জন্য রফা করিয়া কিছু দিনের মত তাহাকে এই আকারে বিশ্বাস করিবার একটা বন্দোবস্ত

হইয়াছে মাত্র; আবার অবস্থা পরিবর্ত্তনে এ চুক্তি ভাঙ্গিলে তাহার জন্য আমরা কিছুমাত্র দায়িক হইব না।

তুলনায় অরুচি।

এইখানে প্রসঙ্গক্রমে একটা কথা বলিবার ইচ্ছা হইতেছে, এই বেলা সেই কথাটা বলিয়া লই, পুনশ্চ পূর্ব্বকথা উত্থাপন করা যাইবে। অনেক লোক আছেন তাঁহারা কথা বার্ত্তাতেই কি, আর কবিতাতেই কি, তুলনা বর্দাস্ত করিতে পারেন না। তুলনাকে তাঁহারা নিতান্ত একটা ঘরগড়া মিথ্যারূপে দেখেন; নিতান্ত অনুগ্রহ-পূর্ব্বক ওটাকে তাঁহারা মানিয়া লন মাত্র। তাঁ-হারা বলেন যেটা যাহা সেটাকে তাহাই বল, সেটাকে আবার আর-একটা বলিলে তাহাকে একটা অলঙ্কার বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি, কিন্তু

তাহাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। ইহাঁরা কঠিন নৈয়ায়িক লোক, ন্যায়শাস্ত্র অনু-সারে সকল কথা বাজাইয়া লন, কবিতার তুলনা উপমা প্রভৃতি ন্যায় শাস্ত্রের নিকট যাচাই করিয়া তবে গ্রহণ করেন। অতএব ইহাঁদের কাছে শাস্ত্র অনুসারেই কথা কহা যাক। জগৎসংসারে কোন্ জিনিষটা একেবারে স্বতন্ত্র, কোন্ জিনিষটা এতবড় প্রতাপান্বিত যে কোন-কিছুর সহিত কোন সম্পর্ক রাখে না? জড়বুদ্ধিরা সকল জিনিষকেই পৃথক করিয়া দেখে, তাহাদের কাছে সবই স্বস্ব-প্রধান। বুদ্ধির যতই উন্নতি হয় ততই সে ঐক্য দেখিতে পায়। বিজ্ঞান বল, দর্শন বল, ক্রমাগত একের প্রতি ধাবমান হইতেছে। সহজ-চক্ষে যাহাদের মধ্যে আকাশ পাতাল, তাহারাও অভেদাত্মা হইয়া দাঁড়াইতেছে। এ বিশ্বরাজ্যে বিজ্ঞান বৈজ্ঞানিক ঐক্য, দর্শন দার্শনিক ঐক্য

দেখাইতেছে, কবিতা কি অপরাধ করিল? তাহার কাজ জগতের সৌন্দর্য্যগত ভাবগত ঐক্য বাহির করা। তুলনার সাহায্যে কবিতা তাহাই করে; তাহাকে যদি তুমি সত্য বলিয়া শিরোধার্য্য না কর, কল্পনার ছেলেখেলা মাত্র মনে কর তাহা হইলে কবিতাকে অন্যায় অপমান করা হয়। কবিতা যখন বলে, তারাগুলি আকাশে চলিতে চলিতে গান গাহিতেছে—যথা

There's not the smallest orb which thou beholdest
But in his motion like an angel sings.

তখন তুমি অনুগ্রহ পূর্ব্বক শুনিয়া গিয়া কবিকে নিতান্তই বাধিত কর। মনে মনে বলিতে থাক, তারা চলিতেছে ইহা স্বীকার করি, কিন্তু কোথায় চলা আর কোথায় গান গাওয়া! চলাটা চোখে দেখিবার বিষয় আর গান গাওয়াটা কানে শুনিবার—তবে অলঙ্কারের হিসাবে মন্দ

হয় নাই। কিন্তু হে তর্কবাচস্পতি, বিজ্ঞান যখন বলে, বাতাসের তরঙ্গ লীলাই ধ্বনি, তখন তুমি কেন বিনা বাক্যব্যয়ে অম্লান বদনে কথা-টাকে গলাধঃকরণ করিয়া ফেল। কোথায় বাতা-সের বিশেষ একরূপ কম্পন নামক গতি, আর কোথায় আমাদের শব্দ শুনিতে পাওয়া! সচরাচর বাতাসের গতি আমাদের স্পর্শের বিষয় কিন্তু শব্দে ও স্পর্শে যে ভাই-ভাই সম্পর্ক ইহা কে জানিত! বৈজ্ঞানিকেরা পরীক্ষা করিয়া জানিয়াছেন, কবিরা হৃদয়ের ভিতর হইতে জানিতেন। কবিরা জানিতেন, হৃদয়ের মধ্যে এমন একটা জায়গা আছে যেখানে শব্দস্পর্শ ঘ্রাণ সমস্ত একাকার হইয়া যায়। তাহারা যতক্ষণ বাহিরে থাকে ততক্ষণ স্বতন্ত্র। তাহারা নানা দিক হইতে নানা দ্রব্য স্বতন্ত্র ভাবে উপা-র্জ্জন করিয়া আনে, কিন্তু হৃদয়ের অন্তঃপুরের

মধ্যে সমস্তই একত্রে জমা করিয়া রাখে," এবং এমনি গলাগলি করিয়া থাকে যে কোন্‌টি যে কে চেনা যায় না। সেখানে গন্ধকে স্পৃশ্য বলিতে আপত্তি নাই, রূপকে গান বলিতে বাধে না। পূর্ব্বেই ত বলা হইয়াছে, যেখানে গভীর সেখানে সমস্তই একাকার। সেখানে হাসিও যা কান্নাও তা, সেখানে সুখমিতি বা দুঃখমিতি বা।

জ্ঞানে যাহারা বর্ব্বর তাহারা যেমন জগতে বৈজ্ঞানিক ঐক্য দার্শনিক ঐক্য দেখিতেও পায় না বুঝিতেও পারে না, তেমনি ভাবে যাহারা বর্ব্বর তাহারা কবিতাগত ঐক্য দেখিতেও পায় না বুঝিতেও পারে না। ইংরাজি সাহিত্য পড়িয়া আমার মনে হয় কবিতায় তুলনা ক্রমেই উন্নতি লাভ করিতেছে, যাহাদের মধ্যে ঐক্য সহজে দেখা যায় না, তাহাদের ঐক্যও বাহির

হইয়া পড়িতেছে। কবিতা, বিজ্ঞান ও দর্শন ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়া চলিতেছে, কিন্তু একেই জায়গায় আসিয়া মিলিবে ও আর কখন বিচ্ছেদ হইবে না।

জগৎ সত্য।

যাহা হউক দেখা যাইতেছে, সবই একাকার হইয়া পড়ে, জগৎটা না থাকিবার মতই হইয়া আসে। যাহা দেখিতেছি তাহা যে তাহাই নহে ইহাই ক্রমাগত মনে হয়। এই জন্যই জগৎকে কেহ কেহ মিথ্যা বলেন। কিন্তু আর এক রকম করিয়া জগৎকে হয়ত সত্য বলা যাইতে পারে।

সত্য যাহা তাহা অদৃশ্য, তাহা কখন ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে তাহা একটা ভাব মাত্র। কিন্তু ভাব আমাদের নিকট নানারূপে প্রকাশ পায়, ভাষা

আকারে, অক্ষর আকারে, বিবিধ বস্তুর বিচিত্র বিন্যাস আকারে। তেমনি প্রকৃত জগৎ যাহা তাহা অদৃশ্য, তাহা কেবল একটি ভাব মাত্র, সেই ভাবটি আমাদের চোখে বহির্জগতরূপে প্রকাশিত হইতেছে। যেমন, যাহা পদার্থ নহে যাহা একটি শক্তি মাত্র তাহাকেই আমরা বিচিত্র বর্ণরূপে আলোকরূপে দেখিতেছি ও উত্তাপ রূপে অনুভব করিতেছি, তেমনি যাহা একটি সত্যমাত্র তাহাকে আমরা বহির্জগত রূপে দেখিতেছি। একজন দেবতার কাছে হয়ত এ জগৎ একেবারেই অদৃশ্য, তাঁহার কাছে আকার নাই আয়তন নাই, গন্ধ নাই, শব্দ নাই স্পর্শ নাই, তাঁহার কাছে কেবল একটা জ্ঞান আছে মাত্র। একটা তুলনা দিই। তুলনাটা ঠিক না হউক একটুখানি কাছাকাছি আসে। আমার যখন বর্ণপরিচয় হয় নাই, তখন যদি আমার

নিকটে একখানা বই আনিয়া দেওয়া হয়—তবে সে বইয়ের প্রত্যেক আঁচড় আমার চক্ষে পড়ে, প্রত্যেক বর্ণ আলাদা আলাদা করিয়া দেখিতে পাই ও সমস্তটা অনর্থক ছেলেখেলা মনে করি। কিন্তু যখন পড়িতে শিখি, তখন আর অক্ষর দেখিতে পাই না। তখন বস্তুতঃ বইটা আমার নিকটে অদৃশ্য হইয়া যায়, কিন্তু তখনি বইটা যথার্থতঃ আমার নিকটে বিরাজ করিতে থাকে। তখন আমি যাহা দেখি তাহা দেখিতে পাই না, আর একটা দেখিতে পাই। তখন আমি বস্তুতঃ দেখিলাম, গ-য়ে আকার ছ, (গাছ) কিন্তু তাহা না দেখিয়া দেখিলাম একটা ডালপালা-বিশিষ্ট উদ্ভিদ্ পদার্থ। কোথায় একটা কালো আঁচড় আর কোথায় একটা বৃহৎ বৃক্ষ! কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত না আমরা বুঝিয়া পড়িতে পারি ততক্ষণ-পর্য্যন্ত ঐ আঁচড়গুলা কি সমস্তই মিথ্যা নহে!

যে ব্যক্তি শাদা কাগজের উপরে হিজিবিজি কাটে তাহাকে কি আমরা নিতান্ত অকর্ম্মণ্য বলিব না! কারণ অক্ষর মিথ্যা। আমার একরূপ অক্ষর আর-একজনের আর-একরূপ অক্ষর। ভাষা মিথ্যা। আমার ভাষা এক তোমার ভাষা আর-এক। আজিকার ভাষা এক কালিকার ভাষা আর-এক। এ ভাষায় বলিলেও হয় ও-ভাষায় বলিলেও হয়। গাছ বলিয়া একটা আওয়াজ শুনিলে আমি মনের মধ্যে যে জিনিষটা দেখিতে পাইব, আর-একজন ব্যক্তি ট্রী বলিয়া একটা আওয়াজ না শুনিলে ঠিক সে জিনিষটা মনে আনিতে পারিবে না। অতএব দেখা যাইতেছে অক্ষর ও ভাষা তুমি ঘরে গড়িয়া বন্দোবস্ত করিয়া বদল করিতে পার, কিন্তু তাহারি আশ্রিত ভাবটিকে খেয়াল অনুসারে বদল করা যায় না, তাহা ধ্রুব।

জগৎকে যে আমাদের মিথ্যা বলিয়া মনে হইতেছে, তাহার কারণ কি এমন হইতে পারে না যে, জগতের বর্ণপরিচয় আমাদের কিছুই হয় নাই! জগতের প্রত্যেক অক্ষর আঁচড়ের আকারে সুতরাং মিথ্যা আকারে আমাদের চোখে পড়িতেছে। যখন আমরা বাস্তবিক জগৎকে পড়িতে পারিব তখন এ জগৎকে দেখিতে পাইব না। এ পড়া কি এক দিনে শেষ হইবে! এ বর্ণমালা কি সামান্য!

এ জগৎ মিথ্যা নয় বুঝি সত্য হবে,
অক্ষর আকারে শুধু লিখিত রয়েছে।
অসীম হতেছে ব্যক্ত সীমা রূপ ধরি!

প্রেমের শিক্ষা।

কিন্তু কে পড়াইবে! কে বুঝাইয়া দিবে যে জগৎ কেবল স্তূপাকৃতি কতকগুলো বস্তু নহে,

উহার মধ্যে ভাব বিরাজমান? আর কেহ নহে প্রেম। জগৎকে যে যথার্থ ভালবাসে সে কখন মনে করিতেও পারে না, জগৎ একটা নিরর্থক জড়পিণ্ড। সে ইহারই মধ্যে অসীমের ও চির-জীবনের আভাস দেখিতে পায়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে প্রেমেই যথার্থ স্বাধীনতা। কারণ যতটা দেখা যায় প্রেমে তার চেয়ে ঢের বেশী দেখাইয়া দেয়!

জগৎকে কখন্ মিথ্যা মনে করিতে পারি না, যখন জগৎকে ভালবাসি! একজন যে-সে লোক মরিয়া গেলে আমরা সহজেই মনে করিতে পারি যে, এ লোক্টা একবারে ধ্বংশ হইয়া গেল, কারণ সে আমার নিকট এত ক্ষুদ্র। কিন্তু একজন প্রিয় ব্যক্তির মরণে আমাদের মনে হয় এ কখনো মরিতে পারে না। কারণ তাহার মধ্যে আমরা অসীমতা দেখিতে পাইয়াছি। যাহাকে এত

বেশী ভাল বাসিয়াছি সে কি একেবারে "নাই" হইয়া যাইতে পারে! সে ত কম লোক নয়! তাহাকে যতখানি হৃদয় দিয়াছি ততখানিই সে গ্রহণ করিয়াছে, তাহার উপরে যতই আশা স্থাপন করিয়াছি ততই আশা ফুরায় নি, রজ্জুবদ্ধ লৌহ-খণ্ডের মত আমার সমস্তটা তাহার মধ্যে ফেলিয়া মাপিতে চেষ্টা করিয়াছি, তাহার তল পাই নাই। যাহার নিকট হইতে সীমা যতদূরে তাহার নিকট হইতে মৃত্যুও তত-দূরে। অতএব এতখানি বিশা-লতার এক মুহূর্ত্তের মধ্যে সর্ব্বতোভাবে অন্তর্ধান এ কখনো সম্ভবপর নহে। প্রেম আমাদের হৃদ-য়ের ভিতর হইতে এই কথা বলিতেছে, তর্ক যাহা বলে বলুক। অতএব দেখা যাইতেছে, প্রেম আসিয়াই আমাদের শিক্ষা দেয় এ জগৎ সত্য এবং প্রেমই বলে সত্য উপরে ভাসিতেছে না, সত্য ইহার অভ্যন্তরে নিহিত আছে। যাহা হউক পথ

দেখিতে পাইলাম, আশা জন্মিতেছে ক্রমে তাহাকে পাইতেও পারি। ইহাকে অবিশ্বাস করিয়া মরণকে বিশ্বাস করিলে কি সুখ! হৃদয়ের সভ্যতার যতই উন্নতি হইবে এই মরণের প্রতি বিশ্বাস ততই চলিয়া যাইবে জীবনের প্রতি বিশ্বাস ততই বাড়িবে।

ভাল করে পড়িব এ জগতের লেখা।
শুধু এ অক্ষর দেখে করিব না ঘৃণা।
লোক হতে লোকান্তরে ভ্রমিতে ভ্রমিতে,
একে একে জগতের পৃষ্ঠা উলটিয়া,
ক্রমে যুগে যুগে হবে জ্ঞানের বিস্তার!
বিশ্বের যথার্থ রূপ কে পায় দেখিতে!
আঁখি মেলি চারিদিকে করিব ভ্রমণ,
ভাল বেসে চাহিব এ জগতের পানে,
তবে ত দেখিতে পাব স্বরূপ ইহার!

ধর্ম্ম।

প্রেমের যোগ্যতা।

একেবারেই প্রেমের যোগ্য নহে এমন জীব কোথায়! যত বড়ই পাপী অসাধু কুশ্রী সে হউক না কেন, তাহার মা ত তাহাকে ভালবাসে। অতএব দেখিতেছি, তাহাকেও ভালবাসা যায়, তবে আমি ভালবাসিতে না পারি সে আমার অসম্পূর্ণতা।

পথ।

যেমন, জড়ই বল আর প্রাণীই বল সকলেরই মধ্যে এক মহা চৈতন্যের নিয়ম কার্য্য করিতেছে, যাহাতে করিয়া উত্তরোত্তর প্রাণ অভিব্যক্ত হইয়া উঠিতেছে, তেমনি পাপীই বল আর সাধুই

বল সকলেরই মধ্যে অসীম পুণ্যের এক আদর্শ বর্ত্তমান থাকিয়া কার্য্য করিতেছে। স্বর্গের পাথেয় সকলেরই কাছে রহিয়াছে, কেহই তাহা হইতে বঞ্চিত নহে। তবে কেহ বা সোজা রাজ-পথে চলিয়াছে, কেহ বা নির্ব্বুদ্ধিতাবশতঃই হউক, কৌতূহলবশতঃই হউক, একবার মোড় ফিরিয়া গলির মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, অবশেষে বহুক্ষণ ধরিয়া এ-গলি ও-গলি সে-গলি করিয়া পুনশ্চ সেই রাজপথে বাহির হইয়া পড়িতেছে, মাঝের হইতে পথ ও পথের কষ্ট বিস্তর বাড়িয়া যাইতেছে। কিন্তু জগতের সমুদয় পথই একই দিকে চলিয়াছে, তবে কোনটার বা ঘোর বেশী, কোনটার বা ঘোর কম এই যা তফাৎ।

পাপ পুণ্য।

অতএব, পাপ বলিয়া যে একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে তাহা নহে। পাপীর যে ধার্ম্মিকের

চেয়ে বেশী কিছু আছে তাহা নহে, ধার্ম্মিকের যতটা আছে পাপীর ততটা নাই এই পর্য্যন্ত। পাপীর ধর্ম্মবুদ্ধি অচেতন অপরিণত। পাপ অভাব, পাপ মিথ্যা, পাপ মৃত্যু। অতএব আর সকলই থাকিবে কেবল পাপ থাকিবে না,— যেমন অন্ধকার-ঈথর কম্পন-প্রভাবে উত্তরোত্তর আলোক হইয়া উঠে, তেমনি পাপ চৈতন্যের প্রভাবে উত্তরোত্তর পুণ্যে পরিণত হইতে থাকিবে।

চেতনা।

যাহা ধ্রুব তাহাই ধর্ম্ম। এই ধ্রুবের আ-শ্রয়ে আছে বলিয়াই জগতের মৃত্যুভয় নাই। একটি ধ্রুবসূত্রে এই সমস্ত বিশ্বচরাচর মালার মতন গাঁথা রহিয়াছে। ক্ষুদ্রতম হইতে বৃহত্তম কিছুই সেই সূত্র হইতে বিচ্ছিন্ন নহে, অতএব

সকলেই ধর্ম্মের বাঁধনে বাঁধা। তবে, সেই বন্ধন-সম্বন্ধে কেহ বা সচেতন কেহ বা অচেতন। অচেতনের বন্ধনই দাসত্ব, আর সচেতনের বন্ধনই প্রেম।

অচৈতন্য।

আমরা যতখানি অচেতন, ততখানি সচেতন নহি ইহা নিশ্চয়ই। আমাদের শরীরের মধ্যে কোথায় কোন্ যন্ত্র কিরূপে কাজ করিতেছে, তাহার কিছুই আমরা জানি না। একটুখানি যেখানে জানি, সেখানে অনেকখানিই জানি না। শরীরের সম্বন্ধে যাহা খাটে, মনের সম্বন্ধেও ঠিক তাহাই খাটে। আমাদের মনে যে কি আছে, তাহা অতি যৎসামান্য পরিমাণে আমরা জানি মাত্র; যাহা জানি না তাহাই অগাধ। কিন্তু যাহা জানিনা তাহাও যে আছে, ইহা অনেকেই

বিশ্বাস করিতে চাহেন না। তাঁহারা বলেন, মনের কার্য্য জানা, মনে আছে অথচ জানিতেছি না, এ কথাটাই স্বতোবিরুদ্ধ কথা—এমন স্থলে না-হয় বলাই গেল যে তাহা নাই।

বিজ্ঞান-গ্রন্থে নিম্নলিখিত ঘটনা অনেকেই পড়িয়া থাকিবেন। একজন মূর্খ দাসী বিকারের অবস্থায় অনর্গল লাটিন আওড়াইতে লাগিল। সহজ-অবস্থায় লাটিনের বিন্দুবিসর্গও সে জানে না। ক্রমে অনুসন্ধান করিয়া জানা গেল, পূর্ব্বে সে একজন লাটিন পণ্ডিতের নিকট দাসী ছিল। যদিও লাটিন শিখে নাই ও জাগ্রত অবস্থায় তাহার লাটিনের স্মৃতি সম্পূর্ণ নিদ্রিত থাকে, তথাপি উক্ত পণ্ডিতকর্ত্তৃক উচ্চারিত লাটিন পদগুলি তাহার মনের মধ্যে সমস্তই বাস করিতেছিল। সকলেই জানেন বিজ্ঞান-গ্রন্থে এরূপ উদাহরণ বিস্তর আছে।

বিস্মৃতি।

আমাদের স্মরণশক্তি অতি ক্ষুদ্র, বিস্মৃতি অতিশয় বৃহৎ। কিন্তু বিস্মৃতি অর্থে ত বিনাশ বুঝায় না। স্মৃতি বিস্মৃতি একই জাতি। একই স্থানে বাস করে। বিস্মৃতির বিকাশকেই বলে স্মৃতি, কিন্তু স্মৃতির অভাবকেই যে বিস্মৃতি বলে তাহা নহে। এই অতি বিপুল বিস্মৃতি আমাদের মনের মধ্যে বাস করিতেছে। বাস করিতেছে মানে কি নিদ্রিত আছে, তাহা নহে। অবিশ্রাম কাজ করিতেছে, এবং কোন কোনটা স্মৃতিরূপে পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে। আমাদের রক্ত চলাচল অনুভব করিতেছি না বলিয়া যে রক্ত চলিতেছে না, তাহা বলিতে পারি না। পুরুষানুক্রমবাহী কতশত গুণ আমাদের মধ্যে অজ্ঞাতসারে বাস করিতেছে। তা-

হার অনেকগুলিই হয়ত আমাতে বিকশিত হইল না, আমার উত্তর পুরুষে বিকশিত হইয়া উঠিবে। এই গুলি, এই অতি নিকটের সামগ্রী গুলিই যদি আমরা না জানিতে পারিলাম, তবে সমস্ত জগতের আত্মা যে আমার মধ্যে গূঢ়ভাবে বিরাজ করিতেছে, তাহা আমি জানিব কি করিয়া! জগতের হৃদয়ের মধ্য দিয়া আমার হৃদয়ে যে একই সূত্র চলিয়া গিয়াছে তাহা অনুভব করিব কি করিয়া! কিন্তু সে অবিশ্রাম তাহার কার্য্য করিতেছে। আমি কি জানি, বিশ্ব-সংসারের প্রত্যেক পরমাণু অহর্নিশি আমাকে আকর্ষণ করিতেছে, এবং আমিও বিশ্ব-সংসারের প্রত্যেক পরমাণুকে অবিশ্রাম আকর্ষণ করিতেছি? কিন্তু জানিনা বলিয়া কোন কাজটা বন্ধ রহিয়াছে!

জগতের বন্ধন।

বিশ্ব-জগতের মধ্যদিয়া আমাদের মধ্যে যে দৃঢ়সূত্র প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে ইহাই ছিন্ন করিয়া ফেলা মুক্তি, এইরূপ কথা শুনা যায়। কিন্তু ছিন্ন করে কাহার সাধ্য! আমি আর জগৎ কি স্বতন্ত্র? কেবল একটা ঘরগড়া বাঁধনে বাঁধা? সেইটে ছিঁড়িয়া ফেলিলেই আমি বাহির হইয়া যাইব? আমিত জগৎ-ছাড়া নই, জগৎ আমা-ছাড়া নয়। আমরা সকলেই জগৎকে গণনা করিবার সময়, আমাকে ছাড়া আর সকলকেই জগতের মধ্যে গণ্য করি, কিন্তু জগৎত সে গণনা মানে না।

জগৎ দিনরাত্রি অনন্তের দিকে ধাবমান হইতেছে কিন্তু তথাপি অনন্ত হইতে অনন্ত দূরে। তাহাই দেখিয়া অধীর হইয়া আমি যদি

মনে করি, জগতের হাত এড়াইতে পারিলেই আমি অনন্ত লাভ করিব, তাহা হয় ত ভ্রম হইতে পারে। অনন্তের উপরে লাফ দেওয়া ত চলে না। আমাদের সমস্ত লম্ফঝম্প এই খানেই। এই জগতের উপরেই লাফাইতেছি এই জগতের উপরেই পড়িতেছি। আর, এই জগতের হাত হইতে অব্যাহতিই বা পাই কি করিয়া? ক'ড়ে আঙ্গুলটা হঠাৎ যদি একদিন এমনতর স্থির করে যে, অসুস্থ শরীরের প্রান্তে বাস করিয়া আমিও অসুস্থ হইয়া পড়িতেছি, অতএব এ শরীরটা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আমি আলাদা ঘর-কন্না করিগে—সে কিরূপ ছেলে মানুষের মত কথাটা হয়! সে যতই বাঁকিতে থাকুক, যতই গা মোড়া দিক্, খানিকটা পর্য্যন্ত তাহার স্বাধীনতা আছে, কিন্তু তাই বলিয়া একেবারে বিচ্ছিন্ন হই-বার ক্ষমতা তাহার হাতে নাই। সমস্ত শরীরের

স্বাস্থ্য তাহার সহিত লিপ্ত, এবং তাহার স্বাস্থ্য সমস্ত শরীরের সহিত লিপ্ত। জগতের এই পরমাণুরাশি হইতে একটি পরমাণু যদি কেহ সরাইতে পারিত তবে আর এ জগৎ কোথায় থাকিত! তেমনি এক জনের খেয়ালের উপরে মাত্র নির্ভর করিয়া জগতের হিসাবে একটি জীবাত্মা কম পড়িতে পারে এমন সম্ভাবনা যদি থাকে, তাহা হইলে সমস্ত জগৎটা 'ফেল' হইয়া যায়। কিন্তু জগতের খাতায় এরূপ বিশৃঙ্খলা এরূপ ভুল হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। অতএব আমাদের বুঝা উচিত জগতের বিরোধী হওয়াও যা' নিজের বিরোধী হওয়াও তা', জগতের সহিত আমাদের এতই ঐক্য।

যে পথে তপন শশি আলো ধ'রে আছে,
সে পথ করিয়া তুচ্ছ, সে আলো ত্যজিয়া,
ক্ষুদ্র এই আপনার খদ্যোত আলোকে,

কেন অন্ধকারে মরি পথ খুঁজে খুঁজে!

*   *   *   *

পাখী যবে উড়ে যায় আকাশের পানে,
সেও ভাবে এনু বুঝি পৃথিবী ত্যজিয়া।
যত ওড়ে, যত ওড়ে, যত ঊর্দ্ধে যায়
কিছুতে পৃথিবী তবু পারে না ত্যেজিতে
অবশেষে শ্রান্ত দেহে নীড়ে ফিরে আসে।

জগতের ধর্ম্ম।

অতএব প্রকৃতির মধ্যে যে ধ্রুব বর্ত্তমান, স্বেচ্ছাপূর্ব্বক সচেতনে সেই ধ্রুবের অনুগামী হওয়াই ধর্ম্ম। ধর্ম্ম শব্দের অর্থই দেখ না কেন। যাহাতে আবরণ বা নিবারণ করে তাহাই বর্ম্ম, যাহাতে ধারণ করে তাহাই ধর্ম্ম। দ্রব্যবিশেষের ধর্ম্ম কি? যাহা অভ্যন্তরে বিরাজ করিয়া সেই দ্রব্যকে ধারণ করিয়া আছে; অর্থাৎ যাহার প্রভাবে

সেই দ্রব্যের দ্রব্যত্ব খাড়া হইয়াছে। জগতের ধৰ্ম্ম কি? জগৎ যে অচল নিয়মের উপর আশ্রয় করিয়া বর্ত্তমান রহিয়াছে তাহাই জগতের ধৰ্ম্ম, এবং তাহাই জগতের প্রত্যেক অণু-কণার ধৰ্ম্ম।

উদাহরণ।

একটি উদাহরণ দিই। জগতের একটি প্রধান ধৰ্ম্ম পরার্থপরতা। স্বার্থপরতা জগতের ধৰ্ম্ম-বিরুদ্ধ। এই নিমিত্ত জগতের কোথাও স্বার্থপর নাই। পরের জন্য কাজ করিতেই হইবে তা' ইচ্ছা কর আর না কর। জগতের প্রত্যেক পরমাণু তাহার পরবর্ত্তী ও তাহার নিকটবর্ত্তীর জন্য, তাহার নিজের মধ্যে তাহার বিরাম নাই। তাহার প্রত্যেক কার্য্য অনন্ত জগতের লক্ষকোটি স্নায়ুর মধ্যে তরঙ্গিত হইতেছে। একটি বালুকণা যদি কেহ ধ্বংশ করিতে

পারে তবে নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের পরিবর্ত্তন হইয়া যায়। তুমি স্বার্থপরভাবে বিদ্যা উপার্জ্জন ও মনের উন্নতি সাধন করিলে, কিন্তু জানিতেও পারিলে না, সে বিদ্যার ও সে উন্নতির লক্ষকোটি উত্তরাধিকারী আছে। তুমি দাও না দাও তোমার সন্তান শ্রেণীর মধ্যে সে উন্নতি প্রবাহিত হইবে। তোমার আশেপাশে চারিদিকে সে উন্নতির ঢেউ লাগিবে। তুমি ত দুই দিনে পৃথিবী হইতে সরিয়া পড়িবে, কিন্তু তোমার জীবনের সমস্তটাই পৃথিবীর জন্য রাখিয়া যাইতে হইবে—তুমি মরিয়া গেলে বলিয়া তোমার জীবনের এক মুহূর্ত্ত হইতে ধরণীকে বঞ্চিত করিতে পারিবে না, প্রকৃতির আইন এমনি কড়াক্কড়।

সচেতন ধর্ম্ম।

অতএব এ জগতে স্বার্থপর হইবার যো নাই। পরার্থপরতাই এ জগতের ধর্ম্ম। এই নিমিত্তই

মানুষের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধর্ম্ম পরের জন্য আত্মোৎসর্গ করা। জগতের ধর্ম্ম আমাদিগকে আগে হইতেই পরের জন্য উৎসৃষ্ট করিয়া রাখিয়াছে, সে বিষয়ে আমরা জগতের জড়াদপি জড়ের সমতুল্য। কিন্তু আমরা যখন স্বেচ্ছায় সচেতনে সেই মহাধর্ম্মের অনুগমন করি তখনই আমাদের মহত্ত্ব, তখনই আমরা জড়ের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কেবল তাহাই নয়, তখনই আমরা মহৎ সুখ লাভ করি। তখনই আমরা দেখিতে পাই যে, স্বার্থপরতায় সমস্ত জগৎকে এক পার্শ্বে ঠেলিয়া তাহার স্থানে অতি ক্ষুদ্র আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাই। কিন্তু পারিব কেন? অহর্নিশি অশান্তি, অসুখ, হৃদয় ক্লান্ত হইয়া পড়ে, কিছুতেই তাহার আরাম থাকে না। যতই সে উপার্জ্জন করিতে থাকে যতই সে সঞ্চয় করিতে থাকে, ততই তাহার ভার বৃদ্ধি হইতে থাকে মাত্র। কিন্তু যখনি আপনাকে

ভুলিয়া পরের জন্য প্রাণপণ করি তখনি দেখি সুখের সীমা নাই। তখনি সহসা অনুভব করিতে থাকি, সমস্ত জগৎ আমার স্বপক্ষে। আমি ছিলাম ক্ষুদ্র হইলাম অত্যন্ত বৃহৎ। চন্দ্র সূর্য্যের সহিত আমার বন্ধুত্ব হইল।

জগত স্রোতে ভেসে চল
যে যেথা আছ ভাই,
চলেছে যেথা রবিশশি
চলরে সেথা যাই!

অপক্ষপাত।

জগত ত কাহাকেও একঘোরে করে না, কাহারো ধোপা নাপিত বন্ধ করে না। চন্দ্র সূর্য্য রৌদ্র বৃষ্টি, জগতের সমস্ত শক্তি সমগ্রের এবং প্রত্যেক অংশের অবিশ্রাম সমান দাসত্ব করিতেছে। তাহার কারণ এই জগতের মধ্যে

যে কেহ বাস করে, কেহই জগতের বিরোধী নহে। পাপী অসাধুরা জগতের নীচের ক্লাশে পড়ে মাত্র, কিন্তু তাই বলিয়া ত তাহাদিগকে ইস্কুল হইতে তাড়াইয়া দিতে পারা যায় না। বাইবেলের অনন্ত নরক একটা সামাজিক জুজু বইত আর কিছু নয়। পাপ নাকি একটা অভাব মাত্র, এই নিমিত্ত সে এত দুর্ব্বল যে তাহাকে পিষিয়া মারিয়া ফেলিবার জন্য একটা অনন্ত জাঁতার আবশ্যক করে না। সমস্ত জগৎ তাহার প্রতিকূলে তাহার সমস্ত শক্তি অহর্নিশি প্রয়োগ করিতেছে। পাপ পুণ্যে পরিণত হইতেছে, আত্মম্ভরিতা বিশ্বম্ভরিতার দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে।

সকলে আত্মীয়।

নিতান্ত ঘৃণা করিয়া আর কাহাকেও একেবারে পর মনে করা শোভা পায় না। সকলেরই

মধ্যে এত ঐক্য আছে। ঘুঁটেমহাশয় মস্ত লোক হইতে পারেন তাই বলিয়া যে গোবরের সঙ্গে সমস্ত আদান প্রদান একেবারেই বন্ধ করিয়া দিবেন ইহা তাঁহার মত উন্নতিশীলের নিতান্ত অনুপযুক্ত কাজ!

জড় ও আত্মা।

পূর্ব্বেই ত বলিয়াছি আমাদের অধিকাংশই অচেতন, একটুখানি সচেতন মাত্র। তবে আর জড়কে দেখিয়া নাসা কুঞ্চিত করা কেন? আমরা একটা প্রকাণ্ড জড় তাহারই মধ্যে একরত্তি চেতনা বাস করিতেছে। আত্মায় ও জড়ে যে বাস্তবিক জাতিগত প্রভেদ আছে তাহা নহে। অবস্থাগত প্রভেদ মাত্র। আলোক ও অন্ধকারে এতই প্রভেদ যে মনে হয় উভয়ে বিরোধীপক্ষ। কিন্তু বিজ্ঞান বলে, আলোকের অপেক্ষাকৃত বিশ্রামই

অন্ধকার এবং অন্ধকারের অপেক্ষাকৃত উদ্যমই আলোক। তেমনি আত্মার নিদ্রাই জড়ত্ব এবং জড়ের চেতনাই আত্মার ভাব।

বিজ্ঞান বলে সূর্য্যকিরণে অন্ধকার রশ্মিই বিস্তর, আলোক-রশ্মি তাহার তুলনায় ঢের কম; একটু খানি আলোক অনেকটা অন্ধকারের মুখ-পাতের স্বরূপ। তেমনি আমাদের মনেও একটু খানি চৈতন্যের সহিত অনেকখানি অচেতনতা জড়িত রহিয়াছে। জগতেও তাহাই। জগৎ একটি প্রকাণ্ড গোলাকার কুঁড়ি, তাহার মুখের কাছটুকুতে একটুখানি চেতনা দেখা দিয়াছে। সেই মুখটুকু যদি উদ্ধত হইয়া বলে আমি মস্ত-লোক, জগৎ অতি নীচ, উহার সংসর্গে থাকিবনা, আমি আলাদা হইয়া যাইব, তবে সে কেমনতর শোনায়?

মৃত্যু।

ধর্ম্মকে আশ্রয় করিলে মৃত্যুভয় থাকে না। এখানে মৃত্যু অর্থে ধ্বংশও নহে, মৃত্যু অর্থে অবস্থা-পরিবর্ত্তনও নহে, মৃত্যু অর্থে জড়তা। অচেতনতাই অধর্ম্ম। ধর্ম্মকে যতই আশ্রয় করিতে থাকিব, ততই চেতনা লাভ করিতে থাকিব, ততই অনুভব করিতে থাকিব, যে মহা-চৈতন্যে সমস্ত চরাচর অনুপ্রাণিত হইয়াছে, আমার মধ্য দিয়া এবং আমাকে প্লাবিত করিয়া সেই চৈতন্যের স্রোত প্রবাহিত হইতেছে। যথার্থ জগৎকে জ্ঞানের দ্বারা জানিবার কোন সম্ভাবনা নাই, চৈতন্য দ্বারা জানিতে হইবে।

জগতের সহিত ঐক্য।

জগৎকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাইয়া সওয়াল-জবাব করাইলে সে খুব অল্প কথাই বলে, জগতের

ঘরে বাস করিলে তবে তাহার যথার্থ খবর পাওয়া যায়। তাহা হইলে জগতের হৃদয় তোমার হৃদয়ে তরঙ্গিত হইতে থাকে; তখন তুমি যে কেবল মাত্র তর্ক দ্বারা জ্ঞানকে জান তাহা নহে, হৃদয়ের দ্বারা জ্ঞানকে অনুভব কর। আমরা যে কিছুই জানিতে পারি না তাহার প্রধান কারণ আমরা নিজেকে জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখি, যখনি হৃদয়ের উন্নতি সহকারে জগতের সহিত অনন্ত ঐক্য মর্ম্মের মধ্যে অনুভব করিতে থাকিব, তখন জগতের হৃদয়-সমুদ্র সমস্ত বাঁধ ভাঙ্গিয়া আমার মধ্যে উথলিত হইয়া উঠিবে, আমি কতখানি জানিব কত খানি পাইব তাহার সীমা নাই। একটুখানি বুদ্বুদের মত অহঙ্কারে ফুলিয়া উঠিয়া স্বাতন্ত্র্য অভিমানে জগতের তরঙ্গে তরঙ্গে ভাসিয়া বেড়াইলে মহত্বও নাই, সুখও নাই। জগতের সহিত এক হইবার উপায়

জগতের অনুকূলতা করা, অর্থাৎ ধর্ম্ম আশ্রয় করা। ধর্ম্ম, জগতের প্রাণগত চেতনা; তিনি নহিলে তোমার অসাড়তা কে দূর করিবে?

মূল ধর্ম্ম।

একজন বলিতেছেন, যখন প্রকৃতির মধ্যে সর্ব্বত্রই নৃশংসতা দেখিতেছি, তখন নিষ্ঠুরতা যে জগতের ধর্ম্ম নহে, এ কে বলিতেছে? জগতের অস্তিত্বই স্বয়ং বলিতেছে। নিষ্ঠুরতাই যদি জগতের মূলগত নিয়ম হইত, হিংসাই যদি জগতের আশ্রয়স্থল হইত তবে জগৎ এক মুহূর্ত্ত বাঁচিত না। উপর হইতে যাহা দেখি তাহা ধর্ম্ম নহে। উপর হইতে আমরা ত চতুর্দ্দিকে পরিবর্ত্তন দেখিতেছি কিন্তু জগতের মূল ধর্ম্ম কি অপরিবর্ত্তনীয়তা নহে? আমরা চারিদিকেই ত অনৈক্য দেখিতেছি, কিন্তু তাহার মূলে কি ঐক্য

বিরাজ করিতেছে না? তাহা যদি না করিত, তাহা হইলে এ জগৎ বিশৃঙ্খলার নরকরাজ্য হইত, সৌন্দর্য্যের স্বর্গরাজ্য হইত না। তাহা হইলে কিছু হইতেই পারিত না, কিছু থাকিতেই পারিত না।

একটি রূপক।

অনেক লোক আছেন, তাঁহারা জগতের সর্ব্বত্রই অমঙ্গল দেখেন। তাঁহাদের মুখে জগতের অবস্থা যেরূপ শুনা যায়, তাহাতে তাহার আর এক মুহূর্ত্ত টিঁকিয়া থাকিবার কথা নহে। সর্ব্বত্রই যে শোক তাপ দুঃখ-যন্ত্রণা দেখিতেছি এ কথা অস্বীকার করা যায় না কিন্তু তবুও ত জগতের সঙ্গীত থামে নাই! তাহার কারণ, জগতের প্রাণের মধ্যে গভীর আনন্দ বিরাজ করিতেছে। সে আনন্দআলোক কিছুতেই আচ্ছন্ন করিতে পারিতেছে না, বরঞ্চ যত কিছু

শোকতাপ সেই দীপ্ত আনন্দে বিলীন হইয়া যাইতেছে। শিবের সহিত জগতের তুলনা হয়। অসীম অন্ধকার-দিক্-বসন পরিয়া ভূতনাথ-পশুপতি জগৎ কোটি কোটি ভূত লইয়া অনন্ত তাণ্ডবে উন্মত্ত। কণ্ঠের মধ্যে বিষপূর্ণ রহিয়াছে তবু নৃত্য। বিষধর সর্প তাঁহার অঙ্গের ভূষণ হইয়া রহিয়াছে, তবু নৃত্য। মরণের রঙ্গভূমি শ্মশানের মধ্যে তাঁহার বাস, তবু নৃত্য। মৃত্যুস্বরূপিনী কালী তাঁহার বক্ষের উপরে সর্ব্বদা বিচরণ করিতেছেন, তবু তাঁহার আনন্দের বিরাম নাই। যাঁহার প্রাণের মধ্যে অমৃত ও আনন্দের অনন্ত প্রস্রবন, এত হলাহল এত অমঙ্গল তিনিই যদি ধারণ করিতে না পারিবেন তবে আর কে পারিবে! সর্পের ফণা, হলাহলের নীলদ্যুতি বাহির হইতে দেখিয়া আমরা শিবকে দুঃখী মনে করিতেছি কিন্তু তাঁহার জটাজালের মধ্যে প্রচ্ছন্ন

চির-স্রোত অমৃত-নিস্যন্দিনী পুণ্য ভাগীরথীর আনন্দ কল্লোল কি শুনা যাইতেছে না? নিজের ডমরুধ্বনিতে, নিজের অস্ফুট হর্ষগানে উন্মত্ত হইয়া নিজে যে অবিশ্রাম নৃত্য করিতেছেন, তাহার গভীর কারণ কি দেখিতে পাইতেছি? বাহিরের লোকে তাঁহাকে দরিদ্র বলিয়া মনে করে বটে, কিন্তু তাঁহার গৃহের মধ্যে দেখ দেখি, অন্নপূর্ণা চিরদিন অধিষ্ঠান করিতেছেন। আর ঐ যে মলিনতা দেখিতেছ, শ্মশানের ভস্ম দেখিতেছ, মৃত্যুর চিহ্ন দেখিতেছ, ও কেবল উপরে—ঐ শ্মশান-ভস্মের মধ্যে আচ্ছন্ন রজত-গিরি-নিভ চারু চন্দ্রাবতংস অতি সুন্দর অমর বপু দেখিতেছ না কি? উনি যে মৃত্যুঞ্জয়; আর, মৃত্যুকে কি আমরা চিনি? আমরা মৃত্যুকে করাল-দশনা লোল-রসনা মূর্ত্তিতে দেখিতেছি, কিন্তু এ মৃত্যুই ইহাঁর প্রিয়তমা, ঐ মৃত্যুকে বক্ষে ধরিয়া ইনি

আনন্দে বিহ্বল হইয়া আছেন। কালীর যথার্থ স্বরূপ আমাদের জানিবার কোন সম্ভাবনা নাই, আমাদের চক্ষে তিনি মৃত্যু আকারে প্রতিভাত হইতেছেন, কিন্তু ভক্তেরা জানেন কালীও যা গৌরীও তাই ; আমরা তাঁহার করালমূর্ত্তি দেখিতেছি, কিন্তু তাঁহার মোহিনীমূর্ত্তি কেহ কেহ বা দেখিয়া থাকিবেন। শিবকে সকলে যোগী বলে। ইনি কাহার যোগে নিমগ্ন রহিয়াছেন ?

যোগী হে, কে তুমি হৃদি আসনে,
বিভূতিভূষিত শুভ্রদেহ, নাচিছ দিক বসনে !
মহা আনন্দে পুলক কায়,
গঙ্গা উথলি উছলি যায়,
ভালে শিশু শশি হাসিয়া চায়
জটাজুট ছায় গগণে।

সৌন্দর্য্য ও প্রেম।

সৌন্দর্য্যের কারণ।

পূর্ব্বে এক স্থানে বলিয়াছি, যে, যখন জগতের স্বপক্ষে থাকি, তখনই আমাদের প্রকৃত সুখ, যখন স্বার্থ খুঁজিয়া মরি তখনই আমাদের ক্লেশ, শ্রান্তি, অসন্তোষ। ইহা হইতে আর-একটা কথা মনে আসে। যাহাদিগকে আমরা সুন্দর বলি তাহাদিগকে আমাদের কেন ভাল লাগে?

পণ্ডিতেরা বলেন, যে সুন্দর তাহার মধ্যে বিষম কিছুই নাই;—তাহার আপনার মধ্যে আপনার পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য; তাহার কোন-একটি অংশ অপর-একটি অংশের সহিত বিবাদ করে না; জেদ করিয়া অন্য সকলকে ছাড়াইয়া উঠে

না ; ঈর্ষ্যাবশতঃ স্বতন্ত্র হইয়া মুখ বাঁকাইয়া থাকে না। তাহার প্রত্যেক অংশ সমগ্রের সুখে সুখী ; তাহারা ভাবে আমরা যে আপনারা সুন্দর সে কেবল সমগ্রকে সুন্দর করিয়া তুলিবার জন্য। তাহারা যদি স্বস্বপ্রধান হইত, তাহারা যদি সকলেই মনে করিত আর সকলের চেয়ে আমিই মস্ত লোক হইয়া উঠিব, এক জন আর এক জনকে না মানিত, তাহা হইলে, না তাহারা নিজে সুন্দর হইত, না তাহাদের সমগ্রটি সুন্দর হইয়া উঠিত। তাহা হইলে একটা বাঁকাচোরা হ্রস্ব দীর্ঘ উঁচু নিচু বিশৃঙ্খল চক্ষুশূল জন্মগ্রহণ করিত। অতএব দেখা যাইতেছে, যথার্থ যে সুন্দর সে প্রেমের আদর্শ। সে প্রেমের প্রভাবেই সুন্দর হইয়াছে, তাহার আদ্যন্তমধ্য প্রেমের সূত্রে গাঁথা ; তাহার কোন খানে বিরোধ বিদ্বেষ নাই। প্রেমের শতদল একটি বৃন্তের উপরে

কি মধুর প্রেমে মিলিয়া থাকে। তাই তাহাকে দেখিতে ভাল লাগে। তাহার কোমলতা মধুর, কারণ কোমলতা প্রেম, কোমলতা কাহাকেও আঘাত করে না, কোমলতা সকলের গায়ে করুণ হস্তক্ষেপ করে, সে চোখের পাতায় স্নেহ আকর্ষণ করিয়া আনে। ইন্দ্রধনুর রংগুলি প্রেমের রং তাহাদের মধ্যে কেমন মিল। তাহারা সকলেই সকলের জন্য জায়গা রাখিয়াছে, কেহ কাহাকেও দূর করিতে চায় না, তাহারা সুরবালিকাদের মত হাত-ধরাধরি করিয়া দেখা দেয়, গলাগলি করিয়া মিলাইয়া যায়। গানের সুরগুলি প্রেমের সুর, তাহারা সকলে মিলিয়া খেলাইতে থাকে, তাহারা পরস্পরকে সাজাইয়া দেয়, তাহারা আপনার সঙ্গিনীদের দূর হইতে ডাকিয়া আনে। এই জন্যই সৌন্দর্য্য মনের মধ্যে প্রেম জন্মাইয়া দেয়, সে আপনার প্রেমে অন্যকে

প্রেমিক করিয়া তুলে, সে আপনি সুন্দর হইয়া অন্যকে সুন্দর করে।

সৌন্দর্য্য বিশ্বপ্রেমী।

যে সুন্দর, কেবল যে তাহার নিজের মধ্যে সামঞ্জস্য আছে তাহা নয়;—সৌন্দর্য্যের সামঞ্জস্য সমস্ত জগতের সঙ্গে। সৌন্দর্য্য জগতের অনুকূল। কদর্য্যতা সয়তানের দলভুক্ত। সে বিদ্রোহী। সে যে টিঁকিয়া থাকে সে কেবল মাত্র গায়ের জোরে। তাও সে থাকিত না, কারণ, কতটুকুই বা তাহার গায়ে জোর; কিন্তু প্রকৃতি তাহা হইতেও বুঝি সৌন্দর্য্য অভিব্যক্ত করিবেন।

মনের মিল।

জগতের সাধারণের সহিত সৌন্দর্য্যের আশ্চর্য্য ঐক্য আছে। জগতের সর্ব্বত্রই তাহার তুলনা তাহার দোসর মেলে। এই জন্য সৌন্দর্য্যকে

সকলের ভাল লাগে। সৌন্দর্য্য যদি একেবারেই নূতন হইত, খাপছাড়া হইত, হটাৎ বাবুর মত একটা কিম্ভূত পদার্থ হইত, তাহা হইলে কি তাহাকে আর কাহারো ভাল লাগিত?

আমাদের মনের মধ্যেই এমন একটা জিনিব আছে, সৌন্দর্য্যের সহিত যাহার অত্যন্ত ঐক্য হয়। এজন্য সৌন্দর্য্যকে দেখিবামাত্র তৎক্ষণাৎ "আমার মিত্র" বলিয়া মনে হয়। জগতে আমরা "সদৃশকে" খুঁজিয়া বেড়াই। যথার্থ সদৃশকে দেখিলেই হৃদয় অগ্রসর হইয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া ডাকিয়া আনে, কিন্তু সৌন্দর্য্যের মধ্যে যেমন আমাদের সাদৃশ্য দেখিতে পাই, এমন আর কোথায়? সৌন্দর্য্যকে দেখিলে তাহাকে আমাদের "মনের মত" বলিয়া মনে হয় কেন? সে-ই আমাদের মনের সঙ্গে ঠিক মেলে, কদর্য্যতার সঙ্গে আমাদের মনের মিল হয় না।

আমরা সকলেই যদি কিছু না কিছু সুন্দর হইতাম, তাহা হইলে সুন্দর ভাল বাসিতাম না!

উপযোগিতা।

যাহা আমাদের উপকারী ও উপযোগী, তাহাই কালক্রমে অভ্যাসবশতঃ আমাদের চক্ষে সুন্দর বলিয়া প্রতীত হয় ও বংশ পরম্পরায় সেই প্রতীতি প্রবাহিত ও পরিপুষ্ট হইতে থাকে, এরূপ কথা কেহ কেহ বলিয়া থাকেন। তাহা যদি সত্য হইত তাহা হইলে লোকে অবসর পাইলে ফুলের বাগানে বেড়াইতে না গিয়া ময়রার দোকানে বেড়াইতে যাইত, ঘরের দেয়ালে লুচি টাঙ্গাইয়া রাখিত ও ফুলদানীর পরিবর্ত্তে সন্দেশের হাঁড়ি টেবিলের উপর বিরাজ করিত।

আমরা সুন্দর।

প্রকৃত কথা এই যে আমরা বাহিরে যেমনই হই না কেন, আমরা বাস্তবিকই সুন্দর। সেই

জন্য সৌন্দর্য্যের সহিতই আমাদের যথার্থ ঐক্য দেখিতে পাই। এই সৌন্দর্য্য-চেতনা সকলের কিছু সমান্ নয়। যাহার হৃদয়ে যত সৌন্দর্য্য বিরাজ করিতেছে, সে ততই সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে পারে। সৌন্দর্য্যের সহিত তাহার নিজের ঐক্য ততই সে বুঝিতে পারে, ও ততই সে আনন্দ লাভ করে। আমি যে, ফুল এত ভালবাসি তাহার কারণ আর কিছু নয়, ফুলের সহিত আমার হৃদয়ের গূঢ় একটি ঐক্য আছে— আমার মনে হয় ও একই কথা, যে সৌন্দর্য্য ফুল হইয়া ফুটিয়াছে, সেই সৌন্দর্য্যই অবস্থাভেদে আমার হৃদয় হইয়া বিকশিত হইয়াছে; সেই জন্য ফুলও আমার হৃদয় চাহিতেছে, আমিও ফুলকে আমার হৃদয়ের মধ্যে চাহিতেছি। মনের মধ্যে একটি বিলাপ উঠিতেছে—যে, আমরা এক পরিবারের লোক, তবে কেন অবস্থান্তর নামক

দেয়ালের আড়ালে পর হইয়া বাস করিতেছি;
কেন পরস্পরকে সর্ব্বতোভাবে পাইতেছি না?

সুদূর ঐক্য।

সৌন্দর্য্যের ঐক্য দেখিয়াই বিক্টর হ্যুগো গান গাহিতেছেন।

মহীয়সী মহিমার আগ্নেয় কুসুম
সূর্য্য, ধায় লভিবারে বিশ্রামের ঘুম।
ভাঙ্গা এক ভিত্তি পরে ফুল শুভ্রবাস,
চারিদিকে শুভ্রদল করিয়া বিকাশ
মাথা তুলে চেয়ে দেখে সুনীল বিমানে
অমর আলোকময় তপনের পানে;
ছোট মাথা দুলাইয়া কহে ফুল গাছে,
"লাবণ্য-কিরণ-ছটা আমারো ত আছে!"

"লঙ্কান্তরে হর্কশ্চ জলেষু পদ্মঃ" ইহাদের মধ্যেও, ঐক্য!

সুন্দর সুন্দর করে।

সুন্দর আপনি সুন্দর এবং অন্যকে সুন্দর করে। কারণ, সৌন্দর্য্য হৃদয়ে প্রেম জাগ্রত করিয়া দেয়, এবং প্রেমই মানুষকে সুন্দর করিয়া তুলে। শারীরিক সৌন্দর্য্যও প্রেমে যেমন দীপ্তি পায় এমন আর কিছুতে না। মানুষের মিলনে যেমন প্রেম আছে, পশুদের মিলনে তেমন প্রেম নাই, এই জন্য বোধ করি, পশুদের অপেক্ষা মানুষের সৌন্দর্য্য পরিস্ফুটতর। যে মানুষ ও যে জাতি পাশব, নিষ্ঠুর, হৃদয়হীন সে মানুষের ও সে জাতির মুখশ্রী সুন্দর হইতে পারে না। দেখা যাইতেছে, দয়ায় সুন্দর করে, প্রেমে সুন্দর করে, হিংসায় নিষ্ঠুরতায় সৌন্দর্য্যের ব্যাঘাত জন্মায়। জগতের অনুকূলতাচরণ করিলে সুন্দর হইয়া উঠি ও প্রতিকূলতা করিলে জগৎ আমাদের গালে কদর্য্যতার চুনকালী মাখাইয়া তাহার রাজপথে

ছাড়িয়া দেয়, আমাদিগকে কেহ সমাদর করিয়া আশ্রয় দেয় না।

শান্তি।

এ শাস্তি বড় সামান্য নয়। আমাদের নিজের মধ্যে সৌন্দর্য্যের ন্যূনতা থাকিলে, আমরা জগতের সৌন্দর্য্য-রাজ্যে প্রবেশাধিকার পাই না, ধরণীর ধুলা-কাদার মধ্যে লুটাইতে থাকি। শব্দ শুনি গান শুনি না, চলাফিরা দেখিতে পাই নৃত্য দেখিতে পাই না, আহার করিয়া পেট ভরাই কিন্তু সুস্বাদ কাহাকে বলে জানি না। জগতের যে অংশে কারাগার সেই খানে গর্ত্ত খুঁড়িয়া অত্যন্ত নিরাপদে বৈষয়িক কেঁচো হইয়া বুড়া বয়স পর্য্যন্ত কাটাইয়া দিই, মৃত্তিকার তলবাসী চক্ষুবিহীন কৃমিদের সহিত কুটুম্বিতা করি, ও তাহাদের সহিত জড়িত বিজড়িত হইয়া স্তূপাকারে নিদ্রা দিই।

উদ্ধার।

এই কৃমিরাজ্য হইতে উদ্ধার পাইয়া আমরা সূর্য্যালোকে আসিতে চাই। কে আনিবে? সৌন্দর্য্য স্বয়ং। কারণ, অশরীরী প্রেম সৌন্দর্য্যে শরীর ধারণ করিয়াছে। প্রেম যেখানে ভাব সৌন্দর্য্য সেখানে তাহার অক্ষর, প্রেম যেখানে হৃদয় সৌন্দর্য্য সেখানে গান, প্রেম যেখানে প্রাণ সৌন্দর্য্য সেখানে শরীর, এই জন্য সৌন্দর্য্যে প্রেম জাগায়, এবং প্রেমে সৌন্দর্য্য জাগাইয়া তুলে।

কবির কাজ।

কবিদের কি কাজ, এইবার দেখা যাইতেছে। সে আর কিছু নয়, আমাদের মনে সৌন্দর্য্য উদ্রেক করিয়া দেওয়া। উপদেশ দিয়া তত্ত্বনির্ণয় করিয়া প্রকৃতিকে মৃতদেহের মত কাটাকুটি করিয়া এ

উদ্দেশ্য সাধন করা যায় না। সুন্দরই সৌন্দর্য্য উদ্রেক করিতে পারে। বৈষয়িকেরা বলেন ইহাতে লাভটা কি? কেবলমাত্র একটি সুন্দর ছবি পাইয়া, বা সুন্দর কথা শুনিয়া উপকার কি হইল? কি জানিলাম? কি শিক্ষালাভ করিলাম; সঞ্চয়ের খাতায় কোন্ নূতন কড়িটা জমা করিলাম? কিছুক্ষণের মত আনন্দ পাইলাম, সে ত সন্দেশ খাইলেও পাই। ততক্ষণ যদি পাঁজি দেখিতাম, তবে আজকেকার তারিখ বার ও কবে চন্দ্রগ্রহণ হইবে সে খবরটা জানিতে পাইতাম।

বৈষয়িকেরা যাহাই বলুন না কেন, আর কোন উদ্দেশ্যের আবশ্যক করে না, মনে সৌন্দর্য্য উদ্রেক করাই যথেষ্ট মহৎ। কবিতার ইহা অপেক্ষা মহত্তর উদ্দেশ্য আর থাকিতে পারে না। সৌন্দর্য্য উদ্রেক করার অর্থ আর কিছু নয়—হৃদয়ের অসাড়তা অচেতনতার বিরুদ্ধে

সংগ্রাম করা, হৃদয়ের স্বাধীনতাক্ষেত্র প্রসারিত করিয়া দেওয়া। সে কার্য্যে যাঁহারা ব্রতী, তাঁহাদের সহিত একটি ময়রার তুলনা ঠিক খাটে না।

অতএব কবিদিগকে আর কিছুই করিতে হইবে না, তাঁহারা কেবল সৌন্দর্য্য ফুটাইতে থাকুন—জগতের সর্ব্বত্র যে সৌন্দর্য্য আছে, তাহা তাঁহাদের হৃদয়ের আলোকে পরিস্ফুট ও উজ্জ্বল হইয়া আমাদের চোখে পড়িতে থাকুক, তবেই আমাদের প্রেম জাগিয়া উঠিবে প্রেম বিশ্বব্যাপী হইয়া পড়িবে।

কবিতা ও তত্ত্ব।

কবিরা যদি একটি তত্ত্ববিশেষকে সমুখে খাড়া করিয়া তাহারই গায়ের মাপে ছাঁটছোঁট করিয়া কবিতার মেরজাই ও পায়জামা বানাইতে থাকেন, ও সেই পোষাকে সুসজ্জিত করিয়া তত্ত্বকে

সমাজে ছাড়িয়া দেন, তবে সে তত্ত্বগুলিকে কেমন খোকা-বাবুর মত দেখায় ও সে কাজটাও ঠিক কবির উপযুক্ত হয় না। এক একবার এমন দর্জ্জীবৃত্তি করিতে দোষ নাই, এবং মোটা মোটা বয়স্ক তত্ত্বেরা যদি মাঝে মাঝে অনুষ্ঠান-বিশেষের সময়ে তাঁহাদের থানধূতি ছাড়িয়া এইরূপ পোষাক পরিয়া সভায় আসিয়া উপস্থিত হন, তাহাতেও তেমন আপত্তি দেখি না। কিন্তু এই যদি প্রথা হইয়া পড়ে, কবিতাটি দেখিলেই যদি দশজনে পড়িয়া তাহার খোলা ও শাঁস ছাড়াইয়া ফেলিয়া তাহা হইতে তত্ত্বের আঁটি বাহির করাই প্রধান কর্ত্তব্য বিবেচনা করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই ক্রমে এমন ফলের চাস হইতে আরম্ভ হইবে, যাহার আঁটিটাই সমস্ত, এবং যে সকল ফলের মধ্যে আঁটির বাহুল্য থাকিবে না শাঁস এবং মধুর রসই অধিক তাহারা নিজের

আঁঠি-দরিদ্র অস্তিত্ব ও মাধুর্য্য রসের আধিক্য লইয়া নিতান্ত লজ্জা অনুভব করিবে। তখন গহনা-পরা গরবিণীকে দেখিয়া ভুবনমোহিনী রূপসীরাও ঈর্ষ্যাদগ্ধ হইবে।

তত্ত্বের বার্দ্ধক্য।

তত্ত্ব অর্থাৎ জ্ঞান পুরাতন হইয়া যায়, মৃত হইয়া যায়, মিথ্যা হইয়া যায়। আজ যে জ্ঞানটি নানা উপায়ে প্রচার করিবার আবশ্যক থাকে, কাল আর থাকে না, কাল তাহা সাধারণের সম্পত্তি হইয়া গিয়াছে, কাল যদি পুনশ্চ সে কথা উত্থাপন করিতে যাও তবে লোকে তোমাকে মারিতে আসে, বলে "আমি কি জাহাজ হইতে নামিয়া আসিলাম, না আমি কাল জন্মগ্রহণ করিয়াছি?" জ্ঞান একটু পুরাতন হইলেই তাহার পুনরুক্তি আর কাহারও সহ্য হয় না।

অনেক জ্ঞান কালক্রমে লোপ পায়, পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়, মিথ্যা হইয়া পড়ে। এমন একদিন ছিল যখন, আমরা শব্দ যে কানেই শুনি সর্ব্বাঙ্গ দিয়া শুনি না, এ কথাটাও নূতন সত্য ছিল। তখন এ কথাটা প্রমাণ দিয়া বুঝাইতে হইত। কিন্তু হৃদয়ের কথা চিরকাল পুরাতন এবং চিরকাল নূতন। বাল্মীকির সময়ে যে সকল তত্ত্ব সত্য বলিয়া প্রচলিত ছিল, তাহাদের অনেকগুলি এখন মিথ্যা বলিয়া স্থির হইয়াছে, কিন্তু সেই প্রাচীন ঋষি-কবি হৃদয়ের যে চিত্র দিয়াছেন, তাহার কোনটাই এখনও অপ্রচলিত হয় নাই।

অতএব জ্ঞান কবিতার বিষয় নহে। কবিতা চিরযৌবনা। এই বুড়ার সহিত বিবাহ দিয়া তাহাকে অল্পবয়সে বিধবা ও অনুমৃতা করা উচিত হয় না।

সৌন্দর্য্যের কাজ।

প্রকৃতির উদ্দেশ্য—জানান' নহে অনুভব করান'। চারিদিক হইতে কেবল নানা উপায়ে হৃদয় আকর্ষণের চেষ্টা হইতেছে। যে জড়-হৃদয় তাহাকেও মুগ্ধ করিতে হইবে, দিবানিশি তাহার কেবল এই যত্ন। তাহার প্রধান ইচ্ছা এই যে, সকলের সকল ভাল লাগে, এত ভাল লাগে যে আপনাকে বা অপরকে কেহ যেন বিনাশ না করে, এত ভাল লাগে যে সকলে সকলের অনুকূল হয়। কারণ এই ইচ্ছার উপর তাহার সমস্ত শুভ তাহার অস্তিত্ব নির্ভর করিতেছে। প্রথম অবস্থায় শাসনের দ্বারা প্রকৃতির এই উদ্দেশ্য সাধিত হয়। প্রথমে দেখিলে, জগৎকে ঘুসি মারিলে তোমার মুষ্টিতে গুরুতর আঘাত লাগে, ক্রমে দেখিলে জগ-

তের সাহায্য করিলে সেও তোমার সাহায্য করে। এরূপ শাসনে এরূপ স্বার্থপরতায় জগতের রক্ষা হয় বটে, কিন্তু তাহাতে আনন্দ কিছুই নাই, তাহাতে জড়ত্ব ও দাসত্বই অধিক। এই জন্য প্রকৃতিতে যেমন শাসনও আছে তেমনি সৌন্দর্য্যও আছে। প্রকৃতির অভিপ্রায় এই, যাহাতে শাসন চলিয়া গিয়া সৌন্দর্য্যের বিস্তার হয়। শাসনের রাজদণ্ড কাড়িয়া লইয়া সৌন্দর্য্যের মাথায় রাজছত্র ধরাই প্রকৃতির চরম উদ্দেশ্য। প্রকৃতি যদি নিষ্ঠুর শাসনপ্রিয় হইত, তাহা হইলে সৌন্দর্য্যের আবশ্যকই থাকিত না। তাহা হইলে প্রভাত মধুর হইত না, ফুল মধুর হইত না, মনুষ্যের মুখশ্রী মধুর হইত না। এই সকল মাধুর্য্যের দ্বারা বেষ্টিত হইয়া আমরা ক্রমশঃ স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত হইতেছি। আমরা ভালবাসিব বলিয়া জগতের হিত সাধন

করিব। তখন ভয় কোথায় থাকিবে! তখন সৌন্দর্য্য জগতের চতুর্দ্দিকে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে! অর্থাৎ আমাদের হৃদয়-কমল-শায়ী সুপ্ত সৌন্দর্য্য জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছেন। তিনি জাগিয়াই আমাদের চতুর্দ্দিকস্থ শাসনের সিপাহীগুলোর নাম কাটিয়া দিয়াছেন জগতের চারিদিকে তাঁহার জয়জয়কার উঠিয়াছে।

স্বাধীনতার পথ প্রদর্শক।

কবিরা সেই সৌন্দর্য্যের কবি, তাঁহারা সেই স্বাধীনতার গান গাহিতেছেন, তাঁহারা সঞ্জীব মন্ত্রবলে হৃদয়ের বন্ধন মোচন করিতেছেন। তাঁহারা সেই শাসনহীন স্বাধীনতার জন্য আমাদের হৃদয়ে সিংহাসন নির্ম্মাণ করিতেছেন, সেই মহারাজা কর্ত্তৃক রক্তপাতহীন জগৎজয়ের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছেন; কবিরা তাঁহারই

সৈন্য। তাঁহারা উপদেশ দিতে আসেন নাই। সজীবতা ও সৌন্দর্য্য লাভ করিবার জন্য কখন কখন তত্ত্ব তাঁহাদের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হয়, তাঁহারা তত্ত্বর কাছে কখন উমেদারী করিতে যান না। কবিরা অমর, কেন না তাঁহাদের বিষয় অমর, অমরতাকে আশ্রয় করিয়াই তাঁহারা গান গাহিয়াছেন। ফুল চিরকাল ফুটিবে, সমীরণ চিরকাল বহিবে, পাখী চিরকাল ডাকিবে, এবং এই ফুলের মধ্যে কবির স্মৃতি বিকশিত, এই সমী-রণের মধ্যে কবির স্মৃতি প্রবাহিত, এই পাখীর গানে কবির গান বাজিয়া ওঠে। কবির নাম নির্জ্জীব পাথরের মধ্যে খোদিত নহে, কবির নাম প্রভাতের নব নব বিকশিত বিচিত্রবর্ণ ফুলের অক্ষরে প্রত্যহ নূতন করিয়া লিখিত হয়। কবি প্রিয়, কারণ, তিনি যাহাদিগকে ভাল বাসিয়া কবি হইয়াছেন, তাহারা চিরকাল প্রিয়, কোন

কালে তাহারা অপ্রিয় ছিল না, কোন কালে তাহারা অপ্রিয় হইবে না।

পুরাতন কথা।

যাঁহারা বলেন সকল কবিরা ঐ এক কথাই বলিয়া আসিতেছেন, নূতন কি বলিতেছেন? তাঁহাদের কথার আর উত্তর দিবার কি আবশ্যক আছে? এক কথায় তাঁহাদের উত্তর দেওয়া যায়। পুরাতন কথা বলেন বলিয়াই কবিরা কবি। তাঁহারা নূতন কথা বলেন না। নূতনকে বিশ্বাস করে কে? নূতনকে অসন্দিগ্ধচিত্তে প্রাণের অন্তঃ-পুরের মধ্যে কে ডাকিয়া লইয়া যাইতে পারে? তাহার বংশাবলীর খবর রাখে কে? কবিরা এমন পুরাতন কথা বলেন, যাহা আমার পক্ষেও খাটে তোমার পক্ষেও খাটে; যাহা আজও আছে, কালও ছিল, আগামী কালও থাকিবে? যাহা

আজও আছে, কালও ছিল, আগামী কালও থাকিবে। যাহা শুনিবামাত্র সুদূর অতীত হইতে সুদূর ভবিষ্যৎ পর্য্যন্ত সকলে সমস্বরে বলিয়া উঠিতে পারে ঠিক কথা! যাহা শুনিয়া আমরা সকলেই আনন্দে বলিতে পারি—পরের হৃদয়ের সহিত আমার হৃদয়ের কি আশ্চর্য্য যোগ, অতীত কালের হৃদয়ের সহিত বর্ত্তমান কালের হৃদয়ের কি আশ্চর্য্য ঐক্য! হৃদয়ের ব্যাপ্তি মুহূর্ত্তের মধ্যে বাড়িয়া যায়!

জ্ঞান ও প্রেম।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে জ্ঞানে প্রেমে অনেক প্রভেদ। জ্ঞানে আমাদের ক্ষমতা বাড়ে, প্রেমে আমাদের অধিকার বাড়ে। জ্ঞান শরীরের মত, প্রেম মনের মত। জ্ঞান কুস্তি করিয়া জয়ী হয়, প্রেম সৌন্দর্য্যের দ্বারা জয়ী হয়। জ্ঞানের দ্বারা

জানা যায় মাত্র, প্রেমের দ্বারা পাওয়া যায়। জ্ঞানেতেই বৃদ্ধ করিয়া দেয়, প্রেমেতেই যৌবন জিয়াইয়া রাখে। জ্ঞানের অধিকার যাহার উপরে তাহা চঞ্চল, প্রেমের অধিকার যাহার উপরে তাহা ধ্রুব। জ্ঞানীর সুখ আত্মগৌরব নামক ক্ষমতার সুখ, প্রেমিকের সুখ আত্ম বিসর্জ্জন নামক স্বাধীনতার সুখ।

নগদ কড়ি।

জ্ঞান যাহা জানে তাহা প্রকৃত জানাই নয়, প্রেম যাহা জানে তাহাই যথার্থ জানা। একজন জ্ঞানী ও প্রেমিকের নিকটে এই সম্বন্ধে একটি পারস্য কবিতার চমৎকার ব্যাখ্যা শুনিয়াছিলাম, তাহার মর্ম্ম লিখিয়া দিতেছি।

পারস্য কবি এইরূপ একটি ছবি দিতেছেন যে, বৃদ্ধ পক্ককেশ জ্ঞান তাহার লোহার সিন্দুকে

চাবি লাগাইয়া বসিয়া আছে; হৃদয় "নগদ কড়ি দাও" "নগদ কড়ি দাও" বলিয়া তাহারই কাছে গিয়া উপস্থিত হইয়াছে, প্রেম এক পাশে বসিয়াছিল, সে হাসিয়া বলিতেছে "মুস্কিল।"

অর্থাৎ জ্ঞান নগদ কড়ি পাইবে কোথায়। সে ত কতকগুলো নোট দিতে পারে মাত্র, কিন্তু সেই নোট ভাঙ্গাইয়া দিবে এমন পোদ্দার কোথায়! জ্ঞানেত কেবল কতকগুলো চিহ্ন দিতে পারে মাত্র, কিন্তু সেই চিহ্নের অর্থ বলিয়া দিবে কে? জগতের সকল ব্যাঙ্কে নোটই দেখিতেছি, চিহ্নই দেখিতেছি, হৃদয় ব্যাকুল হইয়া বলিতেছে, নগদ কড়ি পাইব কোথায়? প্রেমের কাছে পাইবে।

আংশিক ও সম্পূর্ণ অধিকার।

যেমন শরীরের দ্বারা শরীরকেই আয়ত্ত করা যায় তেমনি জ্ঞানের দ্বারা বাহ্যবস্তুর উপরেই

ক্ষমতা জন্মে, মর্ম্মের মধ্যে তাহার প্রবেশ নিষেধ।

একজন ইংরাজ স্ত্রীকবি এই সম্বন্ধে যাহা বলিতেছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। ইহার মর্ম্ম এই যে, যদি অংশ চাও তবে জ্ঞান বা শরীরের দ্বারা পাইবে তাও ভাল করিয়া পাইবে না যদি সমস্ত চাও তবে মন বা প্রেমের দ্বারা পাইবে।

INCLUSIONS

Oh, wilt thou have my hand dear, to lie along in thine ?
As a little stone in a running stream, it seems to lie and pine.
Now drop the poor pale hand, dear, unfit to ply with thine.

Oh wilt thou have my cheek dear, drawn closer to thine own ?

My cheek is white, my cheek is worn, by many a tear run down.
Now leave a little space, dear, lest it should wet thine own.

Oh must thou have my soul, Dear, commingled with thy soul?
Red grows the cheek, and warm the hand, the part is in the whole:
Nor hands nor cheeks keep separate, when soul is joined to soul.

Mrs. Browning.

লক্ষ্মী।

লক্ষ্মী, তুমি শ্রী, তুমি সৌন্দর্য্য, আইস, তুমি আমাদের হৃদয়-কমলাসনে অধিষ্ঠান কর। তুমি যাহার হৃদয়ে বিরাজ কর, তাহার আর দারিদ্র্য ভয় নাই; জগতের সর্ব্বত্রই তাহার ঐশ্বর্য্য। যাহারা লক্ষ্মীছাড়া, তাহারা হৃদয়ের মধ্যে দুর্ভিক্ষ

পোষণ-করিয়া টাকার থলি ও স্থূল উদর বহন করিয়া বেড়ায়। তাহারা অতিশয় দরিদ্র, তাহারা মরুভূমিতে বাস করে; তাহাদের বাসস্থানে ঘাস জন্মায় না, তরুলতা নাই, বসন্ত আসে না।

তুমি বিষ্ণুর গেহিনী। জগতের সর্ব্বত্র তোমার মাতৃস্নেহ। তুমি এই জগতের শীর্ণ কঠিন কঙ্কাল প্রফুল্ল কোমল সৌন্দর্য্যের দ্বারা আচ্ছন্ন করিতেছ। তোমার মধুর করুণ বাণীর দ্বারা জগৎ পরিবারের বিরোধ বিদ্বেষ দূর করিতেছ। তুমি জননী কি না, তাই তুমি শাসন হিংসা ঈর্ষ্যা দেখিতে পার না। তুমি বিশ্ব-চরাচরকে তোমার বিকশিত কমল দলের মধ্যে আচ্ছন্ন করিয়া অনুপম সুগন্ধে মগ্ন করিয়া রাখিতে চাও। সেই সুগন্ধ এখনি পাইতেছি; অশ্রুপূর্ণনেত্রে বলিতেছি, "কোথায় গো! সেই রাঙা চরণ দুখানি আমার হৃদয়ের মধ্যে একবার

স্থাপন কর, তোমার স্নেহহস্তের কোমল স্পর্শে আমার হৃদয়ের পাষাণ-কঠিনতা দূর কর। তোমার চরণ-রেণুর সুগন্ধে সুবাসিত হইয়া আমার হৃদয়ের পুষ্পগুলি তোমার জগতে তোমার সুগন্ধ দান করিতে থাকুক্!

এই যে, তোমার পদ্মবনের গন্ধ কোথা হইতে জগতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। চরাচর উন্মত্ত হইয়া মধুকরের মত দল বাঁধিয়া গুন্ গুন্ গান করিতে করিতে সুনীল আকাশে চারিদিক হইতে উড়িয়া চলিয়াছে!

কথাবার্ত্তা।

সন্ধ্যাবেলায়।

১ম। আমি সন্ধ্যা কেন এত ভালবাসি জিজ্ঞাসা করিতেছ?

সমস্ত দিন আমরা পৃথিবীর মধ্যেই থাকি সন্ধ্যাবেলায় আমরা জগতে বাস করি। সন্ধ্যাবেলায় দেখিতে পাই, পৃথিবী অপেক্ষা পৃথিবীছাড়াই বেশী—এমন লক্ষ লক্ষ পৃথিবী কুচি কুচি সোনার মত আকাশের তলায় ছড়াছড়ি যাইতেছে। জগৎ মহারণ্যের একটি বৃক্ষের একটি শাখার একটি প্রান্তে একটি অতি ক্ষুদ্র ফল প্রতিদিন পাকিতেছে। তাহাই পৃথিবী। দিনে দেখিতাম পৃথিবীর মধ্যে ছোট-খাট যাহা-কিছু সমস্তই চলা-ফিরা করিতেছে সন্ধ্যাবেলায় দেখিতে পাই পৃথিবী স্বয়ং চলিতেছে। রেল-

গাড়ি যেমন পর্ব্বতের খোদিত গুহার মধ্যে প্রবেশ করে—তেমনি, পৃথিবী তাহার কোটি কোটি আরোহী লইয়া একটি সুদীর্ঘ অন্ধকারের গুহার মধ্যে যেন প্রবেশ করিতেছে—এবং সেই ঘোরা নিশীথ-গুহার ছাদের মণ্ডপে অযুত গ্রহ-তারা একেকটি প্রদীপ ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে—তাহারি নীচে দিয়া একটি অতি প্রকাণ্ডকায় গোলক নিঃশব্দে অবিশ্রাম গড়াইয়া চলিতেছে।

২য়। এই বৃহৎ পৃথিবী সত্য সত্যই যে অসীম আকাশে পথচিহ্নহীন পথে অহর্নিশি হূহূ করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে, এক নিমেষও দাঁড়াইতে পারিতেছে না, ইহা একবার মনের মধ্যে অনুভব করিলে কল্পনা স্তম্ভিত হইয়া থাকে।

১ম। এমন একটি পৃথিবী কেন—যখন মনে করিতে চেষ্টা করা যায় যে, ঠিক এই মুহূ-র্ত্তেই অনন্ত জগৎ প্রচণ্ডবেগে চলিতেছে এবং

তাহার প্রত্যেক ক্ষুদ্রতম পরমাণু থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছে ; অতিবৃহৎ অতি গুরুভার লক্ষকোটি অযুত নিযুত চন্দ্র সূর্য্য তারা গ্রহ উপগ্রহ, উল্কা, ধূমকেতু, লক্ষ যোজন ব্যাপ্ত নক্ষত্রবাষ্পরাশি কিছুই স্থির নাই ; অতি বলিষ্ঠ বিরাট এক যাদুকর পুরুষ যেন এই অসংখ্য অনল-গোলক লইয়া অনন্ত আকাশে অবহেলে লোফালুফি করিতেছে (কি তাহার প্রকাণ্ড বলিষ্ঠ বাহু। কি তাহার বজ্রকঠিন বিপুল মাংসপেশী !) প্রতি পলকেই কি অসীম শক্তি ব্যয় হইতেছে—তখন কল্পনা অনন্তের কোন্ প্রান্তে বিন্দু হইয়া হারাইয়া যায়।

২য়। অথচ দেখ, মনে হইতেছে প্রকৃতি কি শান্ত !

১ম। প্রকৃতি আমাদের সকলকে জানাইতে চায় যে, তোমরাই খুব মস্ত লোক—তোমরা আমাকে ছাড়াইয়া গিয়াছ। বিদ্যুৎমায়াবিনীকে

তার দিয়া বাঁধিয়াছ—বাষ্প-দানবকে লৌহ কারা-গারে বাঁধিয়া তাহার দ্বারা কাজ উদ্ধার করি-তেছ। প্রকৃতি যে অতি বৃহৎ কার্য্যগুলি করি-তেছে তাহা আমাদের কাছ হইতে কেমন গোপন করিয়া রাখিয়াছে, আর, আমরা যে অতি ক্ষুদ্র কাজটুকুও করি, তাহাই আমাদের চোখে কেমন দেদীপ্যমান করিয়া দেয়!

২য়। নহিলে, আমরা যদি প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই অনন্তের কাজ চলিতেছে, তাহা হইলে কি আমরা আর কাজ করিতে পারি!

১ম। কম কাজ! বড় হইতে ছোট পর্য্যন্ত দেখ। অতি মহৎ শক্তিসম্পন্ন কত সহস্র নক্ষত্র লোক, অথচ দেখ, তাহারা ছোট ছোট মাণিকের মত কেবল চিক্‌চিক্ করিতেছে মাত্র! আমরা ফুলবাগানের মধ্যে বসিয়া আছি মনে হইতেছে চারিদিকে যেন ছুটি। অথচ প্রতি গাছে

পাতায় ফুলে ঘাসে অবিশ্রাম কাজ চলিতেছে— রাসায়নিক যোগ-বিয়োগের হাট বসিয়া গিয়াছে, কিন্তু দেখ, উহাদের মুখে গলদ্‌ঘর্ম্ম পরিশ্রমের ভাব কিছুমাত্র নাই। কেবল সৌন্দর্য্য, কেবল বিরাম, কেবল শান্তি! আমি যখন আরাম করিতেছি, তখনো আমার আপাদমস্তকে কাজ চলিতেছে—আমার শরীরের প্রত্যেক কাজ যদি মেহন্নত করিয়া আমার নিজেকেই করিতে হইত তাহা হইলে কি আর জীবন ধারণ করিয়া সুখ থাকিত!

২য়। প্রকৃতি বলিতেছে, আমি তোমার জন্য বিস্তর কাজ করিয়া দিতেছি আর তুমি কি তোমার নিজের জন্য কিছু করিবে না! জড়ের সহিত তোমার প্রভেদ এই যে, তোমার নিজের জন্য অনেক কাজ তোমার নিজেকেই করিতে হয়। তুমি পুরুষের মত আহার উপার্জ্জন করিয়া

আন, তার পরে সেটাকে পাকযন্ত্রে রাঁধিয়া লই-বার অতি কৌশলসাধ্য কার্য্য ভার, সে আমার উপরে রহিল, তাহার জন্যে তুমি বেশী ভাবিও না। তুমি কেবল চলিবার উদ্যম কর, দেখিবে আমি তোমাকে চালাইয়া লইয়া যাইব।

১ম। ঠিক কথা, কিন্তু প্রকৃতি কখনো বলে না যে, আমি করিতেছি। আমাদের বেশীর ভাগ কাজ যে প্রকৃতি সম্পন্ন করিয়া দিতেছে, তাহা কি আমরা জানি? আমাদের নিরুদ্যমে যে শতসহস্র কাজ চলিতেছে, তাহা চলিতেছে বলিয়া আমাদের চেতনাই থাকে না। এই যে অতি কোমল বাতাস বহিতেছে, এই যে আমার চোখের সমুখে গঙ্গার ছোট ছোট তরঙ্গগুলি মৃদু মৃদু শব্দ করিতে করিতে তটের উপরে মুহুর্মুহু লুটাইয়া পড়িতেছে ইহারা আমার হৃদয়ের এই অতি তীব্র শোক অহরহ শান্ত করিতেছে। জগ-

তের চতুর্দ্দিক হইতে আমার উপর অবিশ্রাম সান্তনা বর্ষিত হইতেছে অথচ আমি জানিতে পারিতেছি না, অথচ কেহই একটি সান্তনার বাক্য বলিতেছে না—কেবল অলক্ষ্যে অদৃশ্যে আমার আহত হৃদয়ের উপরে তাহাদের মন্ত্রপূত হাত বুলাইয়া যাইতেছে আহাউহুটুকুও বলিতেছে না। আমাদের চতুর্দ্দিকবর্ত্তী এই যে কার্য্যকুশল সদাব্যস্ত ব্যক্তিগণ গুপ্তভাবে থাকে সে কেবল আমাদিগকে ভুলাইবার জন্য; আমাদিগকে জানাইবার জন্য যে আমরাই স্বাধীন।

২য়। অর্থাৎ, অধীনতা খুব প্রকাণ্ড হইলে তাহাকে কতকটা স্বাধীনতা বলা যাইতে পারে—কারাগার যদি মস্ত হয়, তবে তাহাকে কারাগার না বলিলেও চলে। বোধ করি, আমাদিগকে স্থায়ীরূপে অধীন রাখিবার জন্য এই উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে। পাছে মুহুর্মুহু আমাদের

চেতনা হয় যে আমরা অধীন, ও বৈরাগ্য সাধনা দ্বারা প্রকৃতির শাসন লঙ্ঘন করিয়া স্বাধীন হইতে চেষ্টা করি, এই ভয়ে প্রকৃতি আমাদের হাত হইতে হাতকড়ি খুলিয়া লইয়া আমাদিগকে একটা বেড়া-দেওয়া জায়গায় রাখিয়া দিয়াছে। আমরা ভুলিয়া থাকি আমরা অধীনতার দ্বারা বেষ্টিত, মনে করি আমরা ছাড়া পাইয়াছি।

১ম। কিম্বা এমনও হইতে পারে প্রকৃতি আমাদিগকে স্বাধীনতার শিক্ষা দিতেছেন। দেখ না কেন, উত্তরোত্তর কেমন স্বাধীনতারই বিকাশ হইতেছে! জড় যে, সে নিজের জন্য কিছুই করিতে পারে না! উদ্ভিদ তাহার চেয়ে কতকটা উচ্চ। কারণ টিঁকিয়া থাকিবার জন্য খানিকটা যেন তাহার নিজের উদ্যমের আবশ্যক, তাহাকে রস আকর্ষণ করিতে হয়, বাতাস হইতে আহার্য্য সংগ্রহ করিতে হয়। মানুষ এত বেশী স্বাধীন

যে, প্রকৃতি বিস্তর প্রধান প্রধান কাজ বিশ্বাস করিয়া আমাদের নিজের হাতেই রাখিয়া দিয়াছেন। আর, স্বাধীনতা জিনিষ বড় সামান্য নহে। জড়ের কোন বালাই নাই। আমরা, মানুষেরা, কি করিলে যে ভাল হইবে, পদে পদে তাহা ভাবিয়া পাই না। আকুল হইয়া একবার এটা দেখিতেছি, একবার ওটা দেখিতেছি; এবং এইরূপ পরীক্ষা করিতে করিতেই আমরা শতসহস্র করিয়া মারা পড়িতেছি। উত্তরোত্তর যেরূপ স্বাধীনতার বিকাশ হইয়া আসিয়াছে, ইহারই যদি ক্রমিক চালনা হয়, তাহা হইলে মানুষের পর এমন জীব জন্মাইবে, যাহার ক্ষুধা পাইবে না অথচ বিবেচনা পূর্ব্বক আহার করিতে হইবে (অনেক মানুষেরই তাহা করিতে হয়), রক্ত সঞ্চালন ও পরিপাক কার্য্য তাহার নিজের কৌশলে করিয়া লইতে হইবে,

(মানুষের রন্ধন-কার্য্যও কতকটা তাহাই) ভাবিয়া চিন্তিয়া তাহার শরীরের পরিণতি সাধন করিতে হইবে—এক কথায়, তাহার আপাদ-মস্তকের সমস্ত ভার তাহার নিজের হাতে পড়িবে। তাহার প্রত্যেক কার্য্যের ফলাফল সে অনেকটা পর্য্যন্ত দেখিতে পাইবে। একটি কথা কহিলে আঘাত জনিত বাতাসের তরঙ্গ কতদূরে কত বিভিন্ন শক্তিরূপে রূপান্তরিত হইবে তাহা সে জানিবে, এবং তাহার সেই কথার ভাব সমাজের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কত হৃদয়কে কতরূপে বিচলিত করিবে, তাহার ফল পুরুষানুক্রমে কতদূরে কি আকারে প্রবাহিত হইবে তাহা বুঝিতে পারিবে।

২য়। আমাদের স্বাধীনতাও আছে, অধীনতাও আছে, বোধ করি, চিরকালই থাকিবে। স্বাধীনতার যেমন সাধনা আবশ্যক, অধীনতারও

বোধ হয় সেইরূপ সাধনা আবশ্যক। হয়ত বা উৎকর্ষপ্রাপ্ত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অধীনতাকেই যথার্থ স্বাধীনতা বলে। কেবল মাত্র স্বাতন্ত্র্যকে শ্রেষ্ঠ স্বাধীনতা বলে না। যথার্থ যে রাজা সে প্রজার অধীন, পিতা সন্তানের অধীন, দেবতা এই জগতের অধীন। অর্থাৎ স্বাধীনভাবে অধীনতাকেই শ্রেষ্ঠ স্বাধীনতা বলে। জড় পদার্থ অধীন ভাবে অধীন, মানুষেরা অধীন ভাবে স্বাধীন, আর দেবতারা স্বাধীন ভাবে অধীন। আমরা যখন মহত্ত্ব লাভ করিব, তখন আমরা জগতের দাসত্ব করিব, কিন্তু সেই দাসত্ব করাকেই বলে রাজত্ব করা। আর স্বতন্ত্র হওয়াকেই যদি স্বাধীন হওয়া বলে তাহা হইলে ক্ষুদ্রতাকেই বলে স্বাধীনতা, বিনাশকেই বলে স্বাধীনতা।

আত্মা।

আত্মগঠন।

সকল দ্রব্যই, যাহা কিছু নিজের অনুকূল, উপযোগী, তাহাই আপন শক্তি-প্রভাবে চারি দিক হইতে আকর্ষণ করিতে থাকে, বাকী আর সকলের প্রতি তাহার তেমন ক্ষমতা নাই। নিজেকে যথাযোগ্য আকারে ব্যক্ত ও পরিপুষ্ট করিবার পক্ষে যে সকল পদার্থ সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী, উদ্ভিজ্জ-শক্তি কেবল তাহাই জল বায়ু মৃত্তিকা হইতে গ্রহণ করিতে পারে, আর কিছুই না। মানুষের জীবনী শক্তিও কিছুতেই আপনাকে উদ্ভিদ্ শরীরের মধ্যে ব্যক্ত করিতে পারে না। সে নিজের চারিদিকে এমন সকল পদার্থই সঞ্চয় করিতে পারে যাহা তাহার নিজের প্রকাশের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা অনুকূল। মনের মধ্যে

একটা পাপের সঙ্কল্প তাহার চারিদিকে সহস্র পাপের সঙ্কল্প আকর্ষণ করিয়া আপনাকে আকার-বদ্ধ করিয়া তুলে ও প্রতিদিন বৃহৎ হইতে থাকে। পুণ্য-সঙ্কল্পও সেইরূপ। সজীবতার ইহাই লক্ষণ। আমরা যখন একটি প্রবন্ধ লিখি, তখন কিছু সেই প্রবন্ধের প্রত্যেক ভাব প্রত্যেক কথা ভাবিয়া লিখিতে বসি না। একটা মুখ্য সজীব ভাব যদি আমার মনে আবির্ভূত হয়, তবে সে নিজের শক্তি-প্রভাবে আপনার অনুকূল ভাব ও শব্দ গুলি নিজের চারিদিকে গঠিত করিতে থাকে। আমি যে সকল ভাব কোন কালেও ভাবি নাই, তাহাদিগকেও কোথা হইতে আকর্ষণ করিয়া আনে। এইরূপে সে একটি পরিপূর্ণ প্রবন্ধ আকার ধারণ করিয়া আপনাকে আপনি মানুষ করিয়া তুলে। এই জন্য, প্রবন্ধের মর্ম্মস্থিত মুখ্য ভাবটি যত সজীব হয় প্রবন্ধ

ততই ভাল হয় ; নির্জ্জীব ভাব আপনাকে আপনি গড়িতে পারে না, বাহির হইতে তাহার কাঠামো গড়িয়া দিতে হয়। এই নিমিত্ত ভাল লেখা লেখকের পক্ষেও একটি শিক্ষা। তিনি যতই অগ্রসর হইতে থাকেন ততই নূতন জ্ঞান লাভ করিতে থাকেন।

আত্মার সীমা।

আমার মনে হয়, মানুষের আত্মাও এইরূপ ভাবের মত। ভাব নিজেকে ব্যক্ত করিতে চায়। যে টি তাহার নিজের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাহ্য বিকাশ তাহাই আশ্রয় করিতে করিতেই তাহার ক্রমাগত পুষ্টি সাধন হয়। আমরা মনের মধ্যে যাহা অনুভব করি, কার্য্যই তাহার বাহ্য প্রকাশ। এই জন্য আমাদের অধিকাংশ অনুভাব কাজ করিবার

জন্য ব্যাকুল, আবার, কাজ যতই সে করিতে থাকে ততই সে বাড়িয়া উঠিতে থাকে। আমাদের আত্মাও সেইরূপ সর্ব্বাপেক্ষা অনুকূল অবস্থায় নিজেকে প্রকাশ করিতে চায়। এবং সেই প্রকাশ-চেষ্টা রূপ কার্য্যেতেই তাহার উত্তরোত্তর পুষ্টিসাধন হইতে থাকে। চারিদিকের বাতাস হইতে সে আপনার অনুরূপ ভাবনা কামনা প্রবৃত্তি আকর্ষণ করিয়া নিজের আবরণ নিজের সীমা নিজে রচনা করিতে থাকে। অবশিষ্ট আর কিছুরই উপরে তাহার কোন প্রভুত্ব নাই। আমরা সকলেই বন্ধু বান্ধব ও অবস্থার দ্বারা বেষ্টিত হইয়া একটি যেন ডিম্বের মধ্যে বাস করিতেছি, ঐ টুকুর মধ্য হইতেই আমাদের উপযোগী খাদ্য শোষণ করিতেছি। একটি ব্যক্তিবিশেষকে যখন আমরা দেখি, তখন তাহার চারিদিকের মণ্ডলী আমরা দেখিতে পাই না। কিন্তু

তাহার সেই খাদ্যাধার মণ্ডলী তাহার সঙ্গে সঙ্গে অলক্ষিত ভাবে ফিরিতেছে। যে ব্যক্তি সৌন্দর্য্যপ্রিয়, সে তাহার দেহের মধ্যে, তাহার চর্ম্মাবরণ টুকুর মধ্যে, বাস করে না। সে তাহার চারিদিকের তরুলতার মধ্যে আকাশের জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর মধ্যে বাস করে। সে যেখানেই যায় চন্দ্রসূর্য্যময় আকাশ তাহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরে, তৃণ-পত্র পুষ্পময়ী বনশ্রী তাহাকে ঘিরিয়া রাখে। ইহারা তাহার ইন্দ্রিয়ের মত। চন্দ্র সূর্য্যের মধ্য দিয়া সে কি দেখিতে পায়; কুসুমের সৌগন্ধ্য ও সৌন্দর্য্যের সাহায্যে তাহার হৃদয়ের ক্ষুধা নিবৃত্ত হইতে থাকে। এই মণ্ডলীর বিস্তার লইয়া মানুষের ছোটবড়ত্ব। মনুষ্যের যে দেহ মাপিতে পারা যায়, সে দেহ গড়ে প্রায় সকলেরই সমান। কিন্তু যে দেহ দেখা যায় না, মাপা যায় না, তাহার ছোট বড় সামান্য নহে। এই দেহ, এই মণ্ডলী,

এই বৃহৎ দেহ, এই অবস্থা-গোলক, যাহার মধ্যে আমাদের শাবক আত্মার খাদ্য সঞ্চিত ছিল, ইহাই ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া সে পরলোকে জন্মগ্রহণ করে।

মানুষ চেনা।

যেমন মানুষের বৃহৎ দেহটি আমরা দেখিতে পাই না, তেম্‌নি যথার্থ মানুষ যে তাহাকেও দেখিতে পাই না। এই জন্য কাহারও জীবন-চরিত লেখা সম্ভব নহে। কারণ, লেখকেরা মানুষের কাজ দেখিয়া তাহার জীবনচরিত লেখেন। কিন্তু যে গোটাকতক কাজ মানুষ করিয়াছে তাই তিনি দেখিতে পান, লক্ষ লক্ষ কাজ, যাহা সে করে নাই, তাহা ত তিনি দেখিতে পান না। আমরা তাহার কতক গুলা কাজের টুক্‌রা এখান ওখান হইতে কুড়াইয়া

জোড়া দিয়া এক্‌টা জীবন-চরিত খাড়া করিয়া তুলি, কিন্তু তাহার সমগ্রটিত দেখিতে পাই না। তাহার মধ্যস্থিত যে মহাপুরুষ অসংখ্য অবস্থায় অসংখ্য আকার ধারণ করিতে পারিত তাহাকে ত দেখিতে পাই না। তাহার কাজ-কর্ম্মের মধ্যে বরঞ্চ সে ঢাকা পড়িয়া যায়; আমরা কেবল মাত্র উপস্থিতটুকু দেখিতে পাই, যত কাজ হইয়া গিয়াছে, যত কাজ হইবে, এবং যত কাজ হইতে পারিত, উপস্থিত কার্য্য-খণ্ডের সহিত তাহার যোগ দেখিতে পাই না। আমরা মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে এক-একটা কাজ দেখিয়া সেই কার্য্য-কারকের মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে এক-এক্‌টা নাম দিই। সেই নামের প্রভাবে তাহার ব্যক্তি-বিশেষত্ব ঘুচিয়া যায়, সে একটা সাধারন শ্রেণীভুক্ত হইয়া পড়ে, সুতরাং ভিড়ের মধ্যে তাহাকে হারাইয়া ফেলি। আমরা রামকে যখন খুনী বলি, তখন সে পৃথি-

বীর লক্ষ লক্ষ খুনীর সহিত এক হইয়া যায়। কিন্তু রাম-খুনী ও শ্যাম খুনীর মধ্যে এই খুন সম্বন্ধেই এমন আকাশ পাতাল প্রভেদ, যে, উভয়কে এক নাম দিলে বুঝিবার সুবিধা হওয়া দূরে থাকুক্, বুঝিবার ভ্রম হয়। আমরা প্রত্যহ আমাদের কাছের লোকদিগকে এইরূপে ভুল বুঝি। তাড়াতাড়ি তাহাদের এক্-একটা নাম-করণ করিয়া ফেলি ও সেই নামের কৃত্রিম খোলষটার মধ্যেই সে ব্যক্তি ঢাকা পড়িয়া যায়। অনেক সময়ে মানুষ অনুপস্থিত থাকিলেই তাহাকে ঠিক জানিতে পারি। কারণ, সকল মানুষই বৃহৎ। বৃহৎ জিনিষকে দূর হইতে দেখি-লেই তাহার সমস্তটা দেখা যায়, কিন্তু তাহার অত্যন্ত কাছে লিপ্ত থাকিয়া দেখিলে তাহার খানিকটা অংশ দেখা যায় মাত্র, সেই অংশকেই সমস্ত বলিয়া ভ্রম হয়। মানুষ অনুপস্থিত

থাকিলে আমরা তাহার দুই চারি বর্ত্তমান মুহূর্ত্ত মাত্র দেখি না, যত দিন হইতে তাহাকে জানি, ততদিনকার সমষ্টি স্বরূপে তাহাকে জানি। সুতরাং সেই জানাটাই অপেক্ষাকৃত যথার্থ। পৃথিবীর অধিবাসীরা পৃথিবীকে কেহ বলিবে উঁচু, কেহ বলিবে নীচু, কেহ বলিবে উঁচু-নীচু। কিন্তু যে লোক পৃথিবী হইতে আপনাকে তফাৎ করিয়া সমস্ত পৃথিবীটা কল্পনা করিয়া দেখে, সে এই সামান্য উঁচুনীচুগুলিকে গ্রাহ্য না করিয়া বলিতে পারে যে পৃথিবী সমতল গোলক। কথাটা খাঁটি সত্য নহে, কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা সত্য।

শ্রেষ্ঠ অধিকার।

আত্মার উপরে শ্রেষ্ঠ অধিকার কাহার জন্মিয়াছে? যে আত্ম-বিসর্জ্জন করিতে পারে। নাবালক যে, তাহার বিষয় আশয় সমস্তই আছে

বটে, কিন্তু সে বিষয়ের উপর তাহার অধিকার নাই—কারণ তাহার দানের অধিকার নাই। এই দানের অধিকারই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অধিকার। যে ব্যক্তি পরকে দিতে পারে সেই ধনী। যে নিজেও খায় না পরকেও দেয় না কেবল মাত্র জমাইতে থাকে, তাহার নিজের সম্পত্তির উপর কতটুকুইবা অধিকার। যে নিজে খাইতে পারে কিন্তু পরকে দিতে পারে না সেও দরিদ্র—কিন্তু যে পরকে দিতে পারে নিজের সম্পত্তির উপরে তাহার সর্ব্বাঙ্গীন অধিকার জন্মিয়াছে। কারণ, ইহাই চরম অধিকার।

আমাদের পুরাণে যে বলে, যে ব্যক্তি ইহ-জন্মে দান করে নাই সে পরজন্মে দরিদ্র হইয়া জন্মিবে, তাহার অর্থ এইরূপ হইতে পারে যে, টাকা ত আর পরকালে সঙ্গে যাইবে না, সুতরাং টাকাগত ধনিত্ব বৈতরণীর এ পার

পর্য্যন্ত। যদি কিছু সঙ্গে যায় ত সে হৃদয়ের সম্পত্তি। যাহার সমস্ত টাকা কেবল নিজের জন্য—নিজের গাড়িটি ঘোড়াটির জন্যই লাগে, তাহার লাখ টাকা থাকিলেও তাহাকে দরিদ্র বলা যায় এই কারণে—যে, তাহার এত সামান্য আয় যে তাহাতে কেবল তাহার নিজের পেটটাই ভরে, তা'ও ভরে না বুঝি! তাহার কিছুই বাকী থাকে না—যতই কিছু আসে তাহার নিজের অতি মহৎ শূন্যতা পূরাইতে, অতি বৃহৎ দুর্ভিক্ষ-দারিদ্র্য দূর করিতেই খরচ হইয়া যায়। সুতরাং যখন সে বিদায় হয়, তখন তাহার সেই প্রকাণ্ড শূন্যতা ও হৃদয়ের দুর্ভিক্ষই তাহার সঙ্গে সঙ্গে যায়, আর কিছুই যায় না। লোকে বলে, ঢের টাকা রাখিয়া মরিল! ঠিক কথা, কিন্তু এক পয়সাও লইয়া মরিল না।

নিষ্ফল আত্মা।

সুতরাং, আত্মকে যে দিতে পারিয়াছে আত্মা সর্ব্বতোভাবে তাহারই। আত্মা ক্রমশই অভি-ব্যক্ত হইয়া উঠিতেছে। জড় হইতে মনুষ্য-আত্মার অভিব্যক্তি; মধ্যে কত কোটি কোটি বৎসরের ব্যবধান। তেমনি স্বার্থ-সাধন-তৎপর আদিম মনুষ্য ও আত্মবিসর্জ্জন-রত মহদাশয়ের মধ্যে কত যুগের ব্যবধান। একজন নিজের আত্মাকে ভালরূপ পায় নাই, আর এক জনের আত্মা তাহার হাতে আসিয়াছে। আত্মার উপরে যাহার অধিকার জন্মে নাই, সে যে আত্মাকে রক্ষা করিতে পারিবে তাহা কেমন করিয়া বলিব? সকল মনুষ্য নহে—মনুষ্যদের মধ্যে যাঁহারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যথার্থ হিসাবে তাঁহা-দেরই আত্মা আছে। যেমন গুটিকতক ফল ফলাইবার জন্য শতসহস্র নিষ্ফল মুকুলের আব-

শ্যক, তেমনি গুটিকতক অমর আত্মা অভিব্যক্ত হয়, এবং লক্ষ লক্ষ মানবাত্মা নিষ্ফল হয়।

আত্মার অমরতা।

আত্মবিসর্জ্জনের মধ্যেই আত্মার অমরতার লক্ষণ দেখা যায়। যে আত্মায় তাহা দেখা যায় না, সে আত্মার যতই বর্ণ থাকুক ও যতই গন্ধ থাকুক তাহা বন্ধ্যা। একজন মানুষ কেনই বা আত্মবিসর্জ্জন করিবে! পরের জন্য নিজেকে কেনইবা কষ্ট দিবে! ইহার কি যুক্তি আছে! যাহার সহিত নিতান্তই আমার সুখের যোগ, তাহাই আমার অবলম্ব্য আর কিছুর জন্যই আমার মাথাব্যথা নাই, এইত ইহ-সংসারের শাস্ত্র। জগতের প্রত্যেক পরমাণুই আর সমস্ত উপেক্ষা করিয়া নিজে টিকিয়া থাকিবার জন্য প্রাণপণে যুঝিতেছে, সুতরাং স্বার্থপরতার একটা

যুক্তি-সঙ্গত অর্থ দেখা যাইতেছে। কিন্তু এই স্বার্থপরতার উপরে মরণের অভিশাপ দেখা যায়, কারণ ইহা সীমাবদ্ধ। ঐহিকের নিয়ম ঐহিকেই অবসান, সে নিয়ম কেবল এইখানেই খাটে। সে নিয়মে যাহারা চলে তাহারা ঐহিক অতিক্রম করিয়া আর কিছুই দেখিতে পায় না, আর কিছুর উপরেই বিশ্বাস স্থাপন করে না। কেনই বা করিবে? তাহারা দেখিতেছে, এই-খানেই সমস্ত হিসাব মিলিয়া যায়, অন্যত্র অনু-সন্ধানের আবশ্যকই করে না। কিন্তু অমরতা কখন দেখিতে পাই? পৃথিবীর মাটি হইতে উদ্ভূত হইয়া পৃথিবীতেই মিলাইয়া যাইব, এ সন্দেহ কখন দূর হয়? যখন দেখিতে পাই, আমাদের মধ্যে এমন একটি পদার্থ আছে, যে ঐহিকের সকল নিয়ম মানে না। আমরা আপনার মুখ চাই না, আমরা আনন্দের সহিত

আত্মবিসর্জ্জন করিতে পারি, আমরা পরের সুখের জন্য নিজেকে দুঃখ দিতে কাতর হই না। কোথাও ইহার "কেন" খুঁজিয়া পাই না। কেবল হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করিতে পারি যে, নিজের ক্ষুধায় কাতর, সংগ্রাম-পরায়ণ এই জগৎ অতি-ক্রম করিয়া আর এক জগৎ আছে, ইহা সেই-খানকার নিয়ম। সুতরাং এই খানেই পরিণাম দেখিতেছি না। চারিদিকে এই যে বস্তু-জগ-তের ঘোর কারাগার-ভিত্তি উঠিয়াছে, ইহাই আমাদের অনন্ত কবর-ভূমি নহে। অতএব যখনি আমরা আত্ম-বিসর্জ্জন করিতে শিখিলাম, তখনি আমাদের গুরুভার ঐহিক দেহের উপরে দুটি পাখা উঠিল। পৃথিবীর মাটিতে চলিবার সময় সে পাখাদুটির কোন অর্থ বুঝা গেল না। কিন্তু ইহা বুঝা গেল যে ঐ পাখা দুটি কেবল মাত্র তাহার শোভা নহে উহার কার্য্য আছে। তবে

যাহাদের এই পাখা জন্মায় নাই তাহাদেরও কি আকাশে উঠিবার অধিকার আছে?

স্থায়িত্ব।

আমাদের মধ্যে যে সকল উচ্চ আশা, যে সকল মহত্ত্ব বিরাজ করিতেছে তাহারাই স্থায়ী, আর যাহারা তাহাদিগকে বাধা দিয়াছে, তাহাদিগকে কার্য্যে পরিণত হইতে দেয় নাই, তাহারা নশ্বর। তাহারা এইখানকারই জিনিষ, তাহারা কিছু সঙ্গে সঙ্গে যাইবে না। আমার মধ্যে যে সকল নিত্য পদার্থ বিরাজ করিতেছে, তাহা তোমরা দেখিতে পাইতেছ না; তাহাদের চারিদিকে যে জড়স্তূপ উত্থিত হইয়া কিছুদিনের মত তাহাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে, তাহাই তোমরা দেখিতেছ। আমার মনের মধ্যে যে ধর্ম্মের আদর্শ বর্ত্তমান রহিয়াছে তাহারই

উপর আমার স্থায়িত্ব নির্ভর করিতেছে। যখন কাষ্ঠলোষ্ট্রের মত সমস্ত পড়িয়া থাকে তখন ধর্ম্মই আমাদের অনুগমন করে। যাহার আত্মায় এ আদর্শ নাই, দেহের সহিত তাহার সম্পূর্ণ মৃত্যু হয়। জড়ত্বই তাহার পরিণাম। যে গেছে, সে তাহার জীবনের সার পদার্থ লইয়া গেছে, তাহার যা যথার্থ জীবন তাহাই লইয়া গেছে, আর তাহার দুদিনের সুখ দুঃখ, দুদিনের কাজ-কর্ম্ম আমাদের কাছে রাখিয়া গেছে। তাহার জীবনে অনেক সময়ে আজিকার মতের সহিত কালিকার মতের অনৈক্য দেখিয়াছি, এমন কি, তাহার মত একরূপ শুনা গিয়াছে, তাহার কাজ আর একরূপ দেখা গিয়াছে—এই সকল বিরোধ অনৈক্য চঞ্চলতা তাহার আত্মার জড় আবরণের মত এই খানেই পড়িয়া রহিল, ইহাকে অতিক্রম করিয়া যে ঐক্য যে অমরতা অধিষ্ঠিত ছিল,

তাহাই কেবল চলিয়া গেল। যখন তাহার দেহ দগ্ধ করিয়া ফেলিলাম, তখন এগুলিও দগ্ধ করিয়া শ্মশানে ফেলিয়া আসা যাক্। তাহার সেই মৃত অনিত্য-গুলিকে লইয়া অনর্থক সমালোচনা করিয়া কেন তাহার প্রতি অসম্মান করি? তাহার মধ্যে যে সত্য, যে দেবতা ছিল, যে থাকিবে, সেই আমাদের হৃদয়ের মধ্যে অধিষ্ঠান করুক্!

বৈষ্ণব কবির গান।

মর্ত্ত্যের সীমানা।

এক স্থানে মর্ত্ত্যের প্রান্তদেশ আছে, সেখানে দাঁড়াইলে মর্ত্ত্যের পরপার কিছু কিছু যেন দেখা যায়। সে স্থানটা এমন সঙ্কট স্থানে অবস্থিত, যে উহাকে মর্ত্ত্যের প্রান্ত বলিব, কি স্বর্গের প্রান্ত বলিব, ঠিক করিয়া উঠা যায়না—অর্থাৎ উহাকে দুইই বলা যায়। সেই প্রান্তভূমি কোথায়! পৃথিবীর আপিসের কাজে শ্রান্ত হইলে, আমরা কোথায় সেই স্বর্গের বায়ু সেবন করিতে যাই!

স্বর্গের সামগ্রী।

স্বর্গ কি, আগে তাহাই দেখিতে হয়। যেখানে যে কেহ স্বর্গ কল্পনা করিয়াছে, সকলেই নিজ নিজ ক্ষমতা অনুসারে স্বর্গকে সৌন্দর্য্যের সার বলিয়া

কল্পনা করিয়াছে। আমার স্বর্গ আমার সৌন্দর্য্য-কল্পনার চরম তীর্থ। পৃথিবীতে কত কি আছে, কিন্তু মানুষ সৌন্দর্য্য ছাড়া এখানে এমন আর কিছু দেখে নাই, যাহা দিয়া সে তাহার স্বর্গ গঠন করিতে পারে। সৌন্দর্য্য যেন স্বর্গের জিনিষ পৃথিবীতে আসিয়া পড়িয়াছে, এই জন্য পৃথিবী হইতে স্বর্গে কিছু পাঠাইতে হইলে সৌন্দর্য্যকেই পাঠাইতে হয়। এই জন্য সুন্দর জিনিষ যখন ধ্বংশ হইয়া যায়, তখন কবিরা কল্পনা করেন—দেবতারা স্বর্গের অভাব দূর করিবার জন্য উহাকে পৃথিবী হইতে চুরি করিয়া লইয়া গেলেন। এই জন্য পৃথিবীতে সৌন্দর্য্যের উৎকর্ষ দেখিলে উহাকে স্বর্গচ্যুত বলিয়া গোঁজামিলন দিয়া না লইলে যেন হিসাব মিলেনা। এই জন্য, অজ ও ইন্দুমতী সুরলোকবাসী, পৃথিবীতে নির্ব্বাসিত।

মিলন।

তাই মনে হইতেছে, পৃথিবীর যে প্রান্তে স্বর্গের আরম্ভ, সেই প্রান্তটিই যেন সৌন্দর্য্য। সৌন্দর্য্য মাঝে না থাকিলে যেন স্বর্গে মর্ত্ত্যে চিরবিচ্ছেদ হইত। সৌন্দর্য্যে স্বর্গে মর্ত্ত্যে উত্তর প্রত্যুত্তর চলে—সৌন্দর্য্যের মাহাত্ম্যই তাই, নহিলে সৌন্দর্য্য কিছুই নয়।

স্বর্গের গান।

শঙ্খকে সমুদ্র হইতে তুলিয়া আনিলেও সে সমুদ্রের গান ভুলিতে পারে না। উহা কানের কাছে ধর, উহা হইতে অবিশ্রাম সমুদ্রের ধ্বনি শুনিতে পাইবে। পৃথিবীর সৌন্দর্য্যের মর্ম্মস্থলে তেমনি স্বর্গের গান বাজিতে থাকে। কেবল বধির তাহা শুনিতে পায় না। পৃথিবীর পাখীর

গানে পাখীর গানের অতীত আরেকটি গান শুনা যায়, প্রভাতের আলোকে প্রভাতের আলোক অতিক্রম করিয়া আরেকটি আলোক দেখিতে পাই, সুন্দর কবিতায় কবিতার অতীত আরেকটি সৌন্দর্য্য-মহাদেশের তীরভূমি চোখের সম্মুখে রেখার মত পড়ে।

মর্ত্ত্যের বাতায়ন।

এই অনেকটা দেখা যায় বলিয়া আমরা সৌন্দর্য্যকে এত ভালবাসি। পৃথিবীর চারিদিকে দেয়াল, সৌন্দর্য্য তাহার বাতায়ন। পৃথিবীর আর সকলই তাহাদের নিজ নিজ দেহ লইয়া আমাদের চোখের সম্মুখে আড়াল করিয়া দাঁড়ায়, সৌন্দর্য্য তাহা করে না—সৌন্দর্য্যের ভিতর দিয়া আমরা অনন্ত রঙ্গভূমি দেখিতে পাই। এই সৌন্দর্য্য-বাতায়নে বসিয়া আমরা সুদূর আকাশের

নীলিমা দেখি, সুদূর কাননের সমীরণ স্পর্শ করি সুদূর পুষ্পের গন্ধ পাই, স্বর্গের সূর্য্য-কিরণ সেই-খান হইতে আমাদের গৃহের মধ্যে প্রবেশ করে। আমাদের গৃহের স্বাভাবিক অন্ধকার দূর হইয়া যায়, আমাদের হৃদয়ের সঙ্কোচ চলিয়া যায়, সেই আলোকে পরস্পরের মুখ দেখিয়া আমরা পরস্পরকে ভাল বাসিতে পারি। এই বাতায়নে বসিয়া অনন্ত আকাশের জন্য আমাদের প্রাণ যেন হা হা করিতে থাকে, দুই বাহু তুলিয়া সূর্য্য-কিরণে উড়িতে ইচ্ছা যায়, এই সৌন্দর্য্যের শেষ কোথায় অথবা এই সৌন্দর্য্যের আরম্ভ কোথায়, তাহারই অন্বেষণে সুদূর দিগন্তের অভিমুখে বাহির হইয়া পড়িতে ইচ্ছা করে, ঘরে যেন আর মন টেঁকেনা। বাঁশীর শব্দ শুনিলে তাই মন উদাস হইয়া যায়, দক্ষিণা বাতাসে তাই মনটাকে টানিয়া কোথায় বাহির করিয়া লইয়া যায়।

সৌন্দর্য্যচ্ছবিতে তাই আমাদের মনে এক অসীম আকাঙ্ক্ষা উদ্রেক করিয়া দেয়।

সাড়া।

স্বর্গে মর্ত্ত্যে এমনি করিয়াই কথাবার্ত্তা হয়। সৌন্দর্য্যের প্রভাবে আমাদের হৃদয়ের মধ্যে একটি ব্যাকুলতা উঠে, পৃথিবীর কিছুতেই সে যেন তৃপ্তি পায় না। আমাদের হৃদয়ের ভিতর হইতে যে একটি আকুল আকাঙ্ক্ষার গান উঠে, স্বর্গ হইতে তাহার যেন সাড়া পাওয়া যায়।

সৌন্দর্য্যের ধৈর্য্য।

যাহার এমন হয় না, তাহার আজ যদি বা না হয়, কাল হইবেই! আর সকলে বলের দ্বারা অবিলম্বে নিজের ক্ষমতা বিস্তার করিতে চায়, সৌন্দর্য্য কেবল চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে আর

কিছুই করে না। সৌন্দর্য্যের কি অসামান্য ধৈর্য্য এমন কতকাল ধরিয়া প্রভাতের পরে প্রভাত আসিয়াছে, পাখীর পরে পাখী গাহিয়াছে, ফুলের পরে ফুল ফুটিয়াছে, কেহ দেখে নাই, কেহ শোনে নাই। যাহাদের ইন্দ্রিয় ছিল কিন্তু অতীন্দ্রিয় ছিল না, তাহাদের সম্মুখেও জগতের সৌন্দর্য্য উপেক্ষিত হইয়াও প্রতিদিন হাসিমুখে আবির্ভূত হইত। তাহারা গানের শব্দ **শুনিত** মাত্র, ফুলের ফোটা **দেখিত** মাত্র। সমস্তই তাহাদের নিকটে ঘটনা মাত্র ছিল। কিন্তু প্রতি দিন অবিশ্রাম দেখিতে দেখিতে, অবিশ্রাম শুনিতে শুনিতে ক্রমে তাহাদের চক্ষুর পশ্চাতে আরেক চক্ষু বিকশিত হইল, তাহাদের কর্ণের পশ্চাতে আরেক কর্ণ উদ্‌ঘাটিত হইল। ক্রমে তাহারা **ফুল** দেখিতে পাইল, **গান** শুনিতে পাইল। ধৈর্য্যই সৌন্দর্য্যের অস্ত্র। পুরুষদের ক্ষমতা আছে,

তাই এতকাল ধরিয়া রমণীদের উপরে অনিয়ন্ত্রিত কর্ত্তৃত্ব করিয়া আসিতেছিল। রমণীরা আর কিছুই করে নাই, প্রতিদিন তাহাদের সৌন্দর্য্যখানি লইয়া ধৈর্য্য সহকারে সহিয়া আসিতেছিল। অতি ধীরে ধীরে প্রতিদিন সেই সৌন্দর্য্য জয়ী হইতে লাগিল। এখন দানব-বল সৌন্দর্য্য সীতার গায়ে হাত তুলিতে শিহরিয়া উঠে। সভ্যতা যখন বহুদূর অগ্রসর হইবে, তখন বর্ব্বরেরা কেবলমাত্র শারীরিক ও মানসিক ক্ষমতামাত্রের পূজা করিবে না। তখন এই স্নেহপূর্ণ ধৈর্য্য, এই আত্মবিসর্জ্জন, এই মধুর সৌন্দর্য্য, বিনা উপদ্রবে মনুষ্য-হৃদয়ে আপন সিংহাসন প্রতিষ্ঠা করিয়া লইবে। তখন বিষ্ণুদেবের গদার কাজ ফুরাইবে, পদ্ম ফুটিয়া উঠিবে।

জ্ঞানদাসের গান।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সৌন্দর্য্য পৃথিবীতে স্বর্গের বার্ত্তা আনিতেছে। যে বধির, ক্রমশ তাহার বধিরতা দূর হইতেছে। বৈষ্ণব জ্ঞানদাসের একটি গান পাইয়াছি, তাহাই ভাল করিয়া বুঝিতে গিয়া আমার এত কথা মনে পড়িল।

মুরলী করাও উপদেশ।
যে রন্ধ্রে যে ধ্বনি উঠে জানহ বিশেষ।
কোন্ রন্ধ্রে বাজে বাঁশী অতি অনুপাম।
কোন্ রন্ধ্রে রাধা বলে ডাকে আমার নাম॥
কোন্ রন্ধ্রে বাজে বাঁশী সুললিত ধ্বনি।
কোন্ রন্ধ্রে কেকা শব্দে নাচে ময়ূরিণী॥
কোন্ রন্ধ্রে রসালে ফুটয়ে পারিজাত।
কোন্ রন্ধ্রে কদম্ব ফুটে হে প্রাণনাথ॥

কোন্ রন্ধ্রে ষড় ঋতু হয় এককালে।
কোন্ রন্ধ্রে নিধুবন হয় ফুলে ফলে॥
কোন্ রন্ধ্রে কোকিল পঞ্চম স্বরে গায়।
একে একে শিখাইয়া দেহ শ্যাম রায়॥
জ্ঞানদাস কহে হাসি।
"রাধে মোর" বোল বাজিবেক বাঁশী॥

বাঁশীর স্বর।

সৌন্দর্য্য-স্বরূপের হাতে সমস্ত জগতই একটি বাঁশী। ইহার রন্ধ্রে রন্ধ্রে তিনি নিশ্বাস পূরিতেছেন ও ইহার রন্ধ্রে রন্ধ্রে নূতন নূতন সুর উঠিতেছে। মানুষের মন আর কি ঘরে থাকে? তাই সে ব্যাকুল হইয়া বাহির হইতে চায়। সৌন্দর্য্যই তাঁহার আহ্বান গান। সৌন্দর্য্যই সেই দৈববাণী। কদম্ব ফুল তাঁহার বাঁশির স্বর, বসন্ত ঋতু তাঁহার বাঁশীর স্বর, কোকিলের পঞ্চম

তান তাঁহার বাঁশীর স্বর। সে বাঁশীর স্বর কি বলিতেছে! জ্ঞানদাস হাসিয়া বুঝাইলেন, সে কেবল বলিতেছে "রাধে, তুমি আমার"—আর কিছুই না। আমরা শুনিতেছি, সেই অসীম সৌন্দর্য্য অব্যক্ত কণ্ঠে আমাদেরই নাম ধরিয়া ডাকিতেছেন। তিনি বলিতেছেন—"তুমি আমার, তুমি আমার কাছে আইস!" এই জন্য, আমাদের চারিদিকে যখন সৌন্দর্য্য বিকশিত হইয়া উঠে, তখন আমরা যেন একজন কাহার বিরহে কাতর হই, যেন একজন-কাহার সহিত মিলনের জন্য উৎসুক হই—সংসারে আর যাহারই প্রতি মন দিই, মনের পিপাসা যেন দূর হয় না। এই জন্য সংসারে থাকিয়া আমরা যেন চির-বিরহে কাল কাটাই। কানে একটি বাঁশির শব্দ আসিতেছে, মন উদাস হইয়া যাইতেছে, অথচ এ সংসারের অন্তঃপুর ছাড়িয়া বাহির হইতে পারি

না। কে বাঁশী বাজাইয়া আমাদের মন হরণ করিল, তাহাকে দেখিতে পাই না; সংসারের ঘরে ঘরে তাহাকে খুঁজিয়া বেড়াই। অন্য যাহারই সহিত মিলন হউক না কেন, সেই মিলনের মধ্যে একটী চিরস্থায়ী বিরহের ভাব প্রচ্ছন্ন থাকে।

বিপরীত।

আবার এক এক দিন বিপরীত দেখা যায়। জগৎ জগৎপতিকে বাঁশী বাজাইয়া ডাকে। তাঁহার বাঁশী লইয়া তাঁহাকে ডাকে।

আজু কে গো মুরলী বাজায়।
এ ত কভু নহে শ্যামরায়।
ইহার গৌর বরণে করে আলো,
চূড়াটি বাঁধিয়া কেবা দিল।
ইহার বামে দেখি চিকণ বরণী,
নীল উয়লি নীলমণি॥